জ্ঞান ''আমিনপুরের কলন্দক, আমিনপুরের কলন্দক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস।'' —প্রসন্দগটি কী? বশু া কে? মন্ত ব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

জ্ঞান '' মানুষের ভেতরকার এই যে এট্টা ইয়ে, এ তুমি রোধ কর কী করে। মানুষ তো বাঁচিতে চাইবেই।''—কোন পটভূমিকায় কে এই কথাগুলি বলেছেন? কথাগুলির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

জ্ঞান ''এই তো ইতিহাস। উৎরোই আর চড়াই, চড়াই আর উৎরোই।'' কোন্ প্রসন্দেগ কে কাকে এ কথা বলেছেন?

৩। শব্দার্থ লিখুন ঃ

লোভানি, খেলাপ, শরম, ইৎ, অনাহক, গাঁতা, ' ব্যাদরা ছেলে' আহাম্মক।

৪৭.১৬ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী—১

১। উদ্দেশ্য পর্যায়ে ৮ টি উদ্দেশ্যের পরিচয় দেওয়া আছে। এ থেকে যে কোন দুটির উল্লেখ করুন।

২। জ্ঞানর আগুন জ্ঞা১৯৪৩র, খর ১৯৪৪, গর ২য় বিশ্বযুদ্ধ। ভারত ছাড়ো ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন, জনযুদ্ধ নীতি।

জ্ঞানর মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা, যুক্তি তক্কো আর গপ্পো।

৩। 'অরণি,দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের, শ্রীরন্দগম।

৪। জ্ঞানর ৬.৪ -এ মূলপাঠ ১-এর কর অংশ ভাল করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

জ্ঞান অঞ্জনগড়, কেরানী, ল্যাবরেটরী, আগুন, হোমিওপ্যাথী ও জবান বন্ধ্রী—এর যে কোন তিনটির নাম উল্লেখ করুন।

৫। এই পর্বের নাটকের বিষয় বস্তু সমাজের কৃষক, শ্রমিক অবহেলিত শোষিত সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্তের শোষণ- বঞ্চনা। লক্ষছিল এই মানুষগুলির মধ্যে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সংগঠনের মাধ্যমে নিরন্তর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঁচবার প্রেরণা সঞ্চার করা।

অনুশীলনী—২

১। জ্ঞানর ব্ল্যাক মার্কেট, মজুতদার, চতুর্গুণই।

জ্ঞানর খরখানাই, তর, পথই, একাকার।

জ্ঞানর বাপের নাম, বয়ান, হিজ্জ্ব, মুসলিম, দোস্তালি।

২। জ্ঞান ৪২-এর আন্দোলনে অংশ নিয়ে প্রধান সমাদ্দারের দুই পুত্র শ্রীপতি, ভূপতি শহীদ হয়েছে। এই শূণ্যতা বোধ থেকে প্রধান কুঞ্জকে চিত্ত বিহ্বলতা জনিত কারণে এই উক্তি করেছেন।

জ্ঞান ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পুলিশী অত্যাচারে ভীত সন্ত্রস্ত বাংলার গ্রাম বাসীরা যখন

ঘরবাড়ী ছেড়ে বনে বাদাড়ে আশ্রয় নি২েছ তখন এ দৃশ্য দেখে পঞ্চাননী ক্ষোভে দুঃখে কুঞ্জকে একথা বলেছেন।

ড্ডগ্ধ চতুর্থ অন্দ্বক প্রথম দৃশ্যে 'দয়াল' এই কথাগুলি বলেছেন। যুদ্ধ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, মন্বন্তরে-এ যে মানুষগুলি গাঁ ছাড়া হয়েছিল, দুর্যোগের অবসানে তার একে একে গ্রামে ফিরেছে। নতুন করে ঘর বেঁধে, জীবনযাত্রা শুরু করার কালে একে অপরের সন্দ্বেগ কথা বার্তায় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে। দিগম্বরের কথায় সামান্য হতাশার সুর বাজতেই বললেন, মানুষতো বাঁচতেই চায়। এটাইতো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মন্বন্তরে সর্বহারা নিরঞ্জন দেখনা নতুন করে ঘর বেঁধে সকলকে নিয়ে সভা করে, আগামী দিনের সংকট উত্তরণের কথা বলছে। এটা স্বাভাবিক। নিরঞ্জন বলে দুঃখ-কষ্টের কথা তো স্বাভাবিক, সে তো মানুষের চিরসাথী, দু-দণ্ড বসে আলাপ আলোচনা করলে খানিকটা উপশম হতে পারে। সকলে এত সম্মতি দেয়। উদ্ধৃত কথাগুলির মধ্যে দিয়ে এই ইতিবাচক সিদ্ধান্তই তাৎপর্য হিসাবে প্রতিপন্ন।

ড্ডঘ্ধ চতুর্থ অন্দ্বক প্রথম দৃশ্যে গ্রামের মানুষজন এক একে ফিরে এসে নিজেদের পারস্পরিকঅভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে নিরঞ্জন বরকত একথা বলেছেন।

ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি সারাই করে নিজেরাই নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে। কখনও দুর্যোগ যেমন আসে, তার অবসানও হয়—মানুষের জীবনযাত্রা কখনই নিস্তরন্দ্বগ নয়, তার উত্থান-পতন আছে। ধৈর্য্য ধরে তাকে মোকাবিলা করতে হয়। ইতিহাসে এর সাক্ষ্য মিলবে। প্রধান বরকত তার অভিজ্ঞতা থেকে নিরঞ্জনকে এটিই বোঝাতে চেয়েছেন।

৩। লোক দেখান, কথা না রাখা / প্রতিশ্রুতি ভন্দ্বগকরা, ল৭ া, সম্মান, অন্যায়/ অসন্দ্বগত, যৌথ খামার, দুষ্টু/বেয়ারা ছেলে, বোকা।

৪৭.১৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১। বিজন ভট্টাচার্য — নবান্ন ড্ডপ্রথম সংস্করণৰ।

২। দর্শন চৌধুরি — গণনাট্য আন্দ্রোলনের প্রথম পর্যায়।

৩। দিলীপকুমার নন্দ্রী ও নবকুমার মণ্ডল ঃ প্রসন্দ্বগ নবান্ন ড্ডলিপিকাৰ

৪। মন্দ্রিরা রায় — বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রেক্ষিত।

৫। সুধী প্রধান — নবান্ন ঃ প্রযোজনা ও প্রভাব।

একক ৪৮ ❐ নবান্ন নাটকের আলোচনা

৪৮.১ উদ্দেশ্য

৪৮.২ প্রস্তাবনা

৪৮.৩ নবান্ন— রচনা, দেশকাল ও নামকরণ

৪৮.৪ নাটকের বিষয় বস্তু বিশ্লেষণ

৪৮.৫ সারাংশ

৪৮.৬ অনুশীলনী ১

৪৮.৭ নবান্ন নাটকের প্রাসন্দ্বিগক আলোচনা

৪৮.৮ নবান্ন নাটকের গঠন

৪৮.৯ সারাংশ

৪৮.১০ অনুশীলনী ২

৪৮.১১ নবান্ন নাটকের চরিত্র আলোচনা

৪৮.১২ নবান্ন নাটকের সংলাপ ও গান

৪৮.১৩ সারাংশ

৪৮.১৪ অনুশীলনী ৩

৪৮.১৫ 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চ আলো, আবহসংগীত ও অন্যান্য নেপথ্য বিধান

৪৮.১৬ 'নবান্নে'র শেষ দৃশ্যের তাৎপর্য

৪৮.১৭ সারাংশ

৪৮.১৮ অনুশীলনী ৪

৪৮.১৯ উত্তর-সংকেত

৪৮.২০ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

৪৮.১ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী এককটিতে আপনি বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি সম্পূর্ণই পড়েছেন। নাটক পাঠ সূত্রে

আপনি একদিকে যেমন লেখক বিজন ভট্টাচার্যের সৃষ্টিকর্মের সাধারণ পরিচয় পেয়েছেন, সেইসন্দেগ গণনাট্য আন্দোলন ও প্রসন্দগত নবান্ন নাটকের ভূমিকাটিও দেখেছেন।

বর্তমান এককটি পাঠ করে আপনি নাটকটির সাহিত্যিক মূল্য ও সেইসন্দেগ সংলাপ ও মঞ্চ পরিচালনার সম্পর্কে জানবেন।

- জানবেন কোন দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিতে নাটকটির রচনা ও অভিনয়।
- নাটকের 'নবান্ন' নামকরণের তাৎপর্য উপলব্ধিকরবেন।
- নাটকের নয়া ভাবনা ও চরিত্র পরিকল্পনার অভিনবত্ব লক্ষ করুন।
- নাটকটিতে কয়েকটি গানের ব্যবহার করা হয়েছে। গানগুলির প্রয়োগ কতটা তাৎপর্যপূর্ণতা বুঝতে পারবেন।

৪৮.২ প্রস্তাবনা

ভাববাদী শিল্পী দার্শনিকরা মনে করেন, দৈবানুগ্রহে তাদের অনুভবে, মননে, নতুনতর ভাবোদয় হলে, সেটি ব্যক্ত না করা পর্যন্ত, তাঁদের নিস্তার নেই। কিন্তু যাঁরা বস্তু বাদী চিন্তা ও ভাবাদর্শে বিশ্বাসী তাঁরা বস্তুবিশ্বের সার্বিক কল্যাণ ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। 'নবান্ন' নাটক রচনার পেছনে তাই সক্রিয় দেখা যায় সেই সময়ের সমাজমনস্ক ইতিহাস রাজনীতি সচেতন কিছু মানুষ তাঁদের উন্নত চেতনা নিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতির আন্দোলন গানে,গল্পে, নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশে উদ্যত হলেন। গণনাট্য আন্দোলন তাঁরই ফলশ্রুতি।

তাই এঁদের নাট্য প্রযোজনায় বাংলা নাট্যধারায় নতুন প্রাণের জোয়ার দেখা গেল। নাটকে কৃষক শ্রমিকের মধ্যবিত্ত মানুষের কথা এলো। ব্যক্তি চরিত্র থেকে সমষ্টি চরিত্রের প্রাধান্য দেখা গেল। বস্তুতান্ত্রিক জীবনভাবনা, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, আবেগের চেয়ে বুদ্ধি-যুক্তি র প্রাধান্য, শ্রেণী চেতনাসূত্রে সমাজে শোষক-শোষিতের শ্রেণীদ্বন্দ্বের চিত্র নাটকে দেখা দিল। ধনী জমিদার এবং শাসনযন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ আর মমত্ব ও সহানুভূতি প্রকাশ পেল অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল মানুষগুলির জন্য। মঞ্চ ও প্রয়োগ কলায় সমন্বয়, সৃষ্টি করে নানা বৈচিত্র্য আনা হল। এই প্রেক্ষপটে নবান্ন নাটক রচনাও তার ব্যাপক মঞ্চাভিনয়ের আয়োজন, গণনাট্য সংঘের পতাকা তলে। 'নবান্ন' তাই গণনাট্যের নাটক, গণআন্দোলনের নাটক। আর এখানেই তার সিদ্ধি, তার সাফল্য আর ব্যর্থতা। নবান্ন' পাঠ ও আলোচনায় এই কথাগুলি স্মরণ রাখতে হবে।

৪৮.৩ রচনা, দেশকাল ও নামকরণ

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের প্রথম প্রকাশ ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে 'অরণি' পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৮৪৪-এ দ্বিতীয় ১৯৪৫ এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৫ৰ। প্রথম অভিনয় শ্রীরঙ্গমে ২৪ অক্টোবর

১৯৪৪। প্রসন্দগত স্মরণীয় কোনো শিল্পসৃষ্টি দেশকালের সীমার উর্ধের্ব নয়। কালোত্তীর্ণ হতে পারে যে রচনা, তাই চিরন্তনের মর্যাদা পায়।

'নবান্ন' যে দেশকালের প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে সেটি ছিল বড় দুর্যোগের, এক ক্রান্তিকালের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ১৯৩৯ -এ। ভারতের বিদেশী শাসক রাজশক্তি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পরে। একদিকে হিটলারের জার্মানি, মুসোলিনীর ইটালী, ফ্রান্দেকর স্পেন, তোজোর জাপান ও গ্রীসের ফ্যাসিস্ট শক্তি, অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, তার দোসর মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া। ওদিকে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছে। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য সারা পৃথিবী ব্যাপী সংগঠিত হতে প্রয়াসী হয়েছে রমাঁ রলাঁ, গোর্কি, রাসেল, শ প্রভৃতি প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা যুক্ত মঞ্চ তৈরি করে, পৃথিবী ব্যাপী আন্দ্রোলন গড়ে তুলেছেন। কোলকাতাতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হল 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজিম এণ্ড ওয়ার'-এর ভারতীয় কমিটি। এই রাজনৈতিক বাতাবরণে ১৯৪৪ -এ বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটকের প্রকাশ নতুন বার্তা নিয়ে এসেছে। নাটকটি ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের নাট্যবিভাগ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় শ্রীরন্দগমে, ২৪ শে অক্টোবর, ১৯৪৪ নাট্য পরিচালকঃ বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভুনাথ মিত্র। শ্রীরন্দগমে সাতবার অভিনয়ের পর ,শিয়ালদা রেলওয়ে ম্যানসন, শ্রী ও কালিকা থিয়েটার, প্রত্যেকটিতে সাতদিন করে নবান্নের অভিনয় হয়। এই নাটকের মধ্যেদিয়ে অবহেলিত শোষিত সাধারণ মানুষের জীবন, লড়াই, সংগঠন ও সংগ্রামের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষ ও চিন্তাশীল দর্শক সমাজ মতুন করে বাঁচবার একটি পথের নিশানা খুঁজে পেয়েছে।

নাট্যকার স্বয়ং নাটকের পটভূমিকায় পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দ্রোলনকে কেন্দ্র করে এটি রচিত। সে পরিচয় প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী-পুত্রের আত্মবিসর্জনের ঘটনায় প্রতিফলিত। দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি যে সামাজিক- প্রাকৃতিক ঘটনা এ নাটকে ফুটে উঠেছে তা হল ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ই অক্টোবর মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনার একাংশে ঘটেযাওয়া সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে বিপর্যয়ের ইতিহাস। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিণিত হল— বাংলা সন ১৩৫০-এর মন্বন্তর। আর এই মন্বন্তর গ্রাম গঞ্জের চাষী-ক্ষেতমজুরকে ক্ষুধার অন্নের সন্ধানে নিয়ে এসেছে শহরের ফুটপাতে, লন্দগরখানায়। ক্ষুধার জ্বালাতেই প্রধান দোরে দোরে ঘোরে দু-মুঠো ভাতের জন্য, কুঞ্জ ডাস্টবিন থেকে উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করতে করতে গিয়ে কুকুরের সন্দেগ লড়াই করে। ওদিকে মন্বন্তরের সুযোগ নিয়ে কালীধন অতিরিক্ত মুনাফার জন্য চাল গুদামজাত করে কালোবাজারী করে। সে বাশ্রমের আড়ালে নারী দেহের ব্যবসায় লিপ্ত হয়। হারু দত্ত নিরীহ গ্রাম বাসীকে নির্বিচারে শোষন করতে দ্বিধা করেনা। অবশ্যম্ভাবী রুপে দেখা গেল, মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু। দেশকালের এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে গ্রাম বাংলা যখন শ্মশানভূমিতে পরিণত, সেই সর্বস্ব হারানো গ্রামের বাস্তব চিত্র এই 'নবান্ন'।

'ন বান্ন' নাটকের নামকরণের তাৎপর্য :

সমাপ্তি দৃশ্যের অভ্যন্তরে নিহিত আছে 'ন বান্ন' নামকরণের তাৎপর্য। ন বান্ন শব্দটির অর্থ হল নতুন অন্ন। ন বান্ন শব্দটি ভাঙলে তাই দাঁড়ায়। ন ব অন্ন—ন বান্ন। নতুন অন্ন এখানে বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত। ন বান্ন হল নতুন চালের পায়সান্ন। গ্রাম বাংলার কৃষকের নতুন ধান কেটে ঘরে তুলে সেই নতুন ধানের নতুন চালে পায়সান্ন তৈরি করতো। শুধু পায়সান্নই নয় পিঠেপুলিও হত। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে তা আনন্ত্রের সন্দেগ খেত। সমস্ত গ্রাম বাংলায় এটি ছিল একটি বিশেষ উৎসব। এই নির্দিষ্ট দিনটিতে খেলাধূলো, এবং প্রত্যেক অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। মানুষ সমবেত হয়ে সেই অনুষ্ঠান ও খেলাধূলা দেখতো এবং উপভোগ করতো। অবিভশু গ্রাম বাংলার বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে এই ন বান্ন উৎসবে আড়ম্বর ছিল সর্বাধিক। গ্রামের বৌ-ঝিদের এই উৎসবে ছিল এক বিশেষ ভূমিকা। এই উৎসবের সন্দেগ লোকসংস্কৃতির একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অধুনা, সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বহু ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাম্য সংস্কৃতির মতো ন বান্ন উৎসবও আজ বিলুপ্তপ্রায়। তবে এখনো দুই বাংলার গ্রামের প্রান্ত প্রদেশে এই দিনটিতে প্রবেশ করলে ন বান্ন উৎসবে গান বাজনার ভগ্নবিশিষ্টের নিদর্শন পাওয়া যাবে। এখনো মাঝবেলায় কোনো কোনো গ্রাম্য বধূ নতুন বস্ত্র পরিধান করে পবিত্র দেহ মন নিয়ে ন বান্ন রন্ধনে ব্যস্ত থাকে। এখনো কোনো বাড়ির আনাচে কানাচে নাক রাখলে রুপশাল অথবা কামিনীর ন বান্নের সুবাস এসে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে। কোথাও কোথাও গৃহ বধূর আলতা পরা পায়ের আঘাত পড়ে ঢেঁকির পাড়ে, চাল সেই আঘাতে গুঁড়ো হয়ে পিঠে পুলির উপকরণে পরিণত হতে দেখাযায়। অবশ্য এটি অতি বিরল দৃশ্য। যন্ত্রযুগে এটি অতিবিরল দৃশ্য। যন্ত্রযুগে ঢেঁকি উঠে গেছে, এসেছে যন্ত্র। সভ্যতা সমাজকে এগিয়ে এনেছে ঠিক, কিন্তু প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত উৎসব গুলো আজ তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলান্ত তিমিরে। আজ গ্রাম্য সংস্কৃতি হয়ে গেছে প্রায় বিলীন।

'ন বান্ন' নাটক আমাদের মনে স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে তুলে আনে ন বান্ন উৎসবের ছবি। বন্যা, মহাযুদ্ধ-মহামারী আমিনপুরের গ্রাম্যজীবনের সুস্নিগ্ধ দিন যাপন পদ্ধতির বুকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। মানুষ হয়েপড়েছিল জন্তুপ্রায়। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, মান-সভ্রমহীন ভিখিরীতে রুপান্তরিত হয়ে মানুষ ভুলতে বসেছিল আপন অস্তিত্ব। এই রকম এক ভয়ন্দ্বকর এক দুর্যোগ পূর্ণ দিনে যেখানে অস্তিত্বের প্রশ্নটা ছিল সবচাইতে বড় প্রশ্ন, সেখানে ন বান্নের উৎসবের কথা ভাবাই যায়না। কিন্তু এত ঝড় ঝাপটায় সেই মানুষ মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি তার স্মৃতিকে। তাই যখন আবার ঘরছাড়া মানুষগুলো ফিরে এসেছে গ্রামে, নতুন ধান তুলেছে ঘরে, তখন ন বান্ন উৎসবের কথা জেগে উঠেছে। ন বান্ন উৎসবের আনন্ত্রে মেতে ওঠবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তারা। তাই বিগত দিনগুলোর বিভীষিকা মন থেকে মুছে ফেলে আয়োজন করেছে ন বান্ন উৎসবের। এই ন বান্ন উৎসব শুধুমাত্র উৎসব নয়, এর ভেতর একটা মিলনের ইন্দ্বিগত আছে। পূর্বেই আমরা বলেছি, এই উৎসব প্রত্যেক বাড়িতে হত, তবুও প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে প্রত্যেকের সন্দেগ মিলেমিশে আনন্ত্রে অংশগ্রহন করতো। তারপর সমবেত হত কোনো প্রান্তরে, গ্রাম্য সাংস্কৃতির অনুষ্ঠানে

যোগদিয়ে সম্মিলিতভাবে উপভোগ করত সেই আনন্দ। 'নবান্ন' নাটকের শেষে আমরা দেখি সেই রকম এক পরিবেশ। নবান্নের উৎসবে হিন্দু মুসলমান সকলেই সমবেত হয়ে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে। যে হিন্দু মুসলমান অতীতে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়ে একে অপরকে সন্দেহ করেছে, সেই হিন্দু মুসলমান মিলিত হয়েছে নবান্ন উৎসবের চাঁদোয়ার নিচে। নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন,একটা বিরাট ভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে যাঁরা পারস্পরিক হনন লিপ্সায় মেতে ওঠে তাঁরাই স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দিশার প্রীতি ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে দ্বিধা করেনা। কিন্তু কালো রাত্রির মতো সেই ভ্রান্তিটা একদিন কেটে গিয়ে আবার রচিত হয় মিলনের ক্ষেত্র। নবান্ন উৎসব প্রাঙ্গণে তাই দেখা গেল হিন্দু মুসলমান সকলে এসে জড় হয়েছে। শুধু জড় নয়, এই উৎসব ক্ষেত্র থেকে সকলে শপথ গ্রহন করছে আকালের বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিরোধের। সুতরাং 'নবান্ন' নাটকের নামকরণের তাৎপর্য এদিক থেকে যথেষ্ট। নবান্ন উৎসব 'নবান্ন' নাটকে শুধু উৎসব থাকেনি, হিন্দু মুসলমানের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। গণনাটকের যেটি উৎসব প্রধান উদ্দেশ্য—চেতনার বৃদ্ধি ঘটিয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে এক লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে এক আদর্শের পতাকাতলে এনে ফেলা,— নাট্যকার সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নাটকের শেষ দৃশ্যে নবান্নের উৎসবের আয়োজন করেছেন। নাট্যকার তার চরিত্রগুলোকে বহু ঝড় ঝাপটা বহু বিসর্পিল পথ ঘুরিয়ে পুনরায় অতি পরিচিত নবান্ন উৎসবের অনাবিল আনন্দের মধ্যে এনে জীবনের একটি ইতিবাচক ইন্দিগতের দ্যোতনা করেছেন।

৪৮.৪ নাটকের বিষয় বস্তু বিশ্লেষণ

'নবান্ন' চার অন্দেকর নাটক। প্রথম অন্দেক দৃশ্য সংখ্যা পাঁচ। দ্বিতীয়ে পাঁচ, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙেক দুই ও তিনটি দৃশ্য আছে । অর্থাৎ মোট পনেরোটি দৃশ্য সমাবেশের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার গ্রাম ও শহর জীবনের শন্দবকা ও সন্দবকটের চিত্র তুলে ধরে সমস্যার একটি ইতিহাচক সমাধানসূত্র তুলে ধরেছেন।

রাতের অন্ধ্রকারে মালভূমির মত উঁচু জায়গায় কতকগুলি ছায়ামূর্তির আনাগোনা দিয়ে নাট্যদৃশ্যের সূচনা। পটভূমিতে আগুনের আভা, বাইরে বাঁশের গাঁট ফাটার মধ্য দিয়ে মেসিনগানের আওয়াজ বোঝানো হয়েছে। পরিবেশের মধ্যে বেশ একটি সন্ত্রস্তু ভাব। আগষ্ট আন্দ্রোলনের পটভূমিতে গাঁয়ের মধ্যে একটি সদা সন্ত্রস্তু ভাব বিরাজ করছে। বৃদ্ধপ্রধান সমাদ্দার আগষ্ট আন্দ্রোলনের কর্মী তাঁর দুই ছেলেকে হারিয়ে বিলাপ করছে। তার স্ত্রী পঞ্চাননীও মেয়েদের ইৎ নষ্ট হয়েছ দেখে এবং স্বদেশের টানে নিজে আন্দ্রোলনে যোগ দিয়ে, পিছিয়ে পড়া কর্মীদের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাওয়ার আবেদন জানায়েছ। পথেই পুলিশের গুলিতে সে মৃত্যু বরণ করে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে কুঞ্জ,প্রধান, নিরঞ্জনের সন্দেগ রাধিকা,বিনোদিনীর পারস্পারিক সংলাপের মধ্য দিয়ে বর্তমান সংকটের দিনে অভাবী সংসারের সরল মানুষগুলির পারস্পরিক কলহ উত্তাপের ছবি ফুটে উঠেছে। সংসারের ভার বহনে যখন পুরুষরা অসহায় ও হীনমন্যতায় ভুগছে তখন নারীদের অসহায়তা ও সেইসন্দেগ

অসহিষ্ণুতা বোধ আরও বেশি হবে ,এতে বিস্ময়ের কিছু নেই । এর পরিচয় পাওয়া যায় কুঞ্জ রাধিকা ও নিরঞ্জন-বিনোদিনীর কথোপকথনে।

তৃতীয় দৃশ্যে সংকটের আরও ঘনীভূত রূপ দেখা যায় প্রধানের জমি বিক্রি করবার উদ্যোগের মধ্যে অন্নাভাবগ্রস্ত মানুষের এই দুর্দশার সুযোগ নেয়, হারাধনের মত পোদ্দার রা। অপর কৃষক দয়াল এ-ভাবেই সব হারিয়েছে, এমন কি বীজধান পর্যন্ত। অবশেষে তাকে প্রতিবেশী সমাদ্দার বাড়ি চালের সন্ধানে যেতে হয়েছে। স্ত্রী রাঙার মা ''ধুঁকছে কাল বিকেল থেকে''। এই দৃশ্যেরই শেষে আকস্মিকভাবে ঝড় ওঠে, সাইক্লোনে প্রধানের দোচালা বিনোদিনীর মাথার ওপর ভেঙে পড়ে—সে অচৈতন্য হয়ে যায়। ওদিকে বন্যায় সব ভেসে যায়। দয়াল বাড়ি গিয়ে দেখে রাঙা, রাঙার মা বন্যায় ভেসে গেছে।

চতুর্থ দৃশ্যে এরই পরিণতিতে ভয়াবহ অভাব ও অন্নসংকট। ''নিত্যি ঐ এক ডুমুরের কলা সেদ্ধ, আর কচুর নতির ঝোল''— এর বিরুদ্ধে কুঞ্জের ছেলে মাখন বিদ্রোহ করে।*

পঞ্চম দৃশ্যে ওদিকে হারু দত্তের লোভ প্রধানের জমির জন্য। প্রধান সব বোঝে। তার সন্দেগ জমি বিক্রি নিয়ে কথা হয়। প্রধান রাজি না হওয়ায় সে নতুন ভাবে চাপ দেয়। কুঞ্জ উপলব্ধি করে ''টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েছে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দাও।'' হারুর লোকজন কুঞ্জ ও প্রধানকে মারে। মাখন এ দৃশ্য দেখে মাথা ঘুড়ে পড়ে যায়। তার মৃত্যু সমস্ত পরিবারকে বিচলিত করে।

দ্বিতীয় অন্দেকর শুরু শহরে। কোলকাতার চাল ব্যবসায়ী কালীধন ধাড়ার দোকানে নিরঞ্জন রাখহরি নাম নিয়ে মজুরের কাজ করে। হারু দত্ত গ্রাম থেকে চাল ও মেয়েমানুষ সংগ্রহ করে কালীধনকে সরবরাহ করে। অতিরিশু মুনাফার লোভে মজুরদারী ও কালোবাজারী যুদ্ধকালীন ব্যবস্টথায় যে জেঁকে বসেছে তার ছায়া এই দুটি চরিত্র সমাবেশের মধ্য দিয়ে দেখা যায়। এরা বিবেকহীন ও হৃদয়হীন ও অমানবিক বাণিজ্যিকতার জাল সমাজের সর্বত্র বিস্তৃত করে রাখে—সে পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যায়ভাবে চড়া দামে চাল বিক্রির প্রতিবাদ করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে বশংবদ কর্মচারী ধৃষ্টতা প্রকাশ করে বলে ''কত জন ম্যাজিস্ট্রেট এই বাবুট্যাকে রাইখবার পারে তা নি জানো।'' এদেরই চক্রান্তে ও রাষ্ট্রশশি র পৃষ্ঠপোষণায় 'মনুষ্যসৃষ্টি দুর্ভিক্ষ' লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়।

অপর দৃশ্যে দেখা যায় সমাদ্দার পরিবার গ্রাম ছেড়ে শহরের পার্কে আশ্রয় নিয়েছে দুমুঠো খাবার আশায়। এরই মধ্যে বিচিত্র ধরনের সুযোগ সন্ধানীরা নানা রূপে ও বেশে জীর্ণশীর্ণ বস্ত্রহীন এই নিরন্ন কন্দকালসার মানুষগুলোকে নিয়ে নির্ল৭ ভাবে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হয়। এদের কেউ ফটোগ্রাফার, কেউ বা টাউট। প্রথমোশু রা প্রধানের ভাষায় 'কন্দকালের ছবির ব্যবসাদার,' তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যে প্রধান,

*''About 50 per cent of the people are dying from starvation at present and about 40 per cent are living in semi-starvation, subsisting on herbs vegetables, and other inedible and undigestable food. People are also dying of cholera.'' (Quoted from 'Biplabi,' July 29, 1943–a weekly published from underground in and around Tamluk–Sutahata, Midnapur. Edited and Compiled by B.Chakraborty).

কুঞ্জ, রাধিকা রাজপথের খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। প্রথমোক্ত জন বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে ক্ষুধার অন্ন জোগাতে পারছে না, আর অপরজন ডাস্টবিনের খাবার নিয়ে কুকুরে-মানুষে লড়াই করছে। এ দৃশ্য বড় মর্মান্তিক। ওদিকে বড়লোকের বাড়ি পানভোজনের সমারোহ, কিন্তু সামান্য উদ্বৃত্তটুকুও দুর্গত মানুষের কল্যাণে দিতে এদের হাত ,সরেনা। ওদিকে দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে হারু একদিকে বিপন্ন মানুষের জমি বাড়ি সস্তায় কিনে নেয়, অপরদিকে গ্রামের দুঃস্থ মা-বাপকে ভুল বুঝিয়ে মেয়ে কেনে, শহরে চালান দেয়। কালীধনের সেবাশ্রম সেবা-নামের আড়ালে নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

অকস্মাৎ কালীধনের দোকানে দারোগা পুলিশের আবির্ভাব—চালক্রেতা ভদ্রলোক তাদের নিয়ে এসেছেন। নিরঞ্জন ইতোমধ্যে সেবাশ্রমে বিনোদিনীর সাক্ষাৎ পেয়েছে। নিরঞ্জন চালের গুদাম ও সেবাশ্রমের ব্যবসার সব পরিচয় তুলে ধরলে পুলিশ ওদের হাতকড়ি পরিয়ে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু তাদের উভয়ের দৃষ্টিতে এমন একটি ভাব ধরা পড়ে যে তাদের ছাড়া পেতেও অসুবিধে হবে না।

তৃতীয় অন্দ্বক সংক্ষি৫—দুটি দৃশ্য, একটি লন্দ্বগরখানার, অপরটি চিকিৎসা কেন্দ্রের। প্রথমটিতে ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল। এরই মধ্যে উপস্থিত কুঞ্জ রাধিকা ও অন্যান্য গ্রামের মানুষ। এদের কথা বার্তায় প্লাবনশেষে ফসলের প্রাচর্যের নানা গল্পকথা। একজন বৃদ্ধভিখারী শহরজীবনের যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা থেকে সকলকে গ্রামে ফিরে যেতে বলে। কুঞ্জ রাধিকাও পোড়ামাটির শহর ছেড়ে স্বগ্রামে ফিরে যাওয়ার সন্দ্বকল্প নেয়। আর দ্বিতীয় দৃশ্য চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রধানকে দেখা যায়। এই চিকিৎসা কেন্দ্রে কোন সাধারণ চিকিৎসারও আয়োজন নেই, চিকিৎসার নামে এক রকম প্রহসন চলছে। এখানে প্রধানকে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় দেখা যায়। দৃশ্যের শেষে বলা তার কথাটি "ভুলে যাও তোমার ব্যথার কথা" বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

চতুর্থ অন্দ্বেকর তিনটি দৃশ্য, প্রথমটি বেশ বড়। ঘটনাস্থল আমিনপুর। শহর থেকে ঘরে ফিরে আসা মানুষরা নিজ নিজ বাড়িতে উপস্থিত। নিরঞ্জনের উদ্যোগে, দয়ালের পরামর্শে প্রধানের বাড়িতে সকলে সমবেত হয়ে আগামী দিনের সম্ভাব্য সন্দ্বকট উত্তরণের জন্য পরামর্শে নিযুক্ত। নানা ধরনের কথা বার্তার শেষে সকলে সমবেত ভাবে খাটার সন্দ্বকল্পে নিজেদের সুখী ভবিষ্যৎ গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর মিলনের সুখময় পরিবেশ—ভাইয়ে ভাইয়ে পুনর্মিলনের আবেগময় দৃশ্য রচনা করে। দ্বিতীয় দৃশ্যে তারই সম্প্রসারিত রূপ—খেটে ফসল তুলে, ঝাড়াই-এর পর ধর্ম গোলায় কুঞ্জ হিসেবের বেশি ধান প্রথম জমা দেয়। ঠিক করে এবার নবান্ন উৎসব ধুমধাম করে করা হবে। সমাদ্দার পরিবারের বারবার মনে পড়ে প্রধানের কথা।

শেষ দৃশ্যে 'নবান্ন' এর উৎসব চলছে। গ্রামের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সকাল সমবেত হয়েছে। চলছে কৃষক রমণীর গান নাচ আর মোরগের লড়াই, গরুর দৌড়—জয় হল ফেকু মিঞার মোরগের আর রহমত উল্লার গরুর। অকস্মাৎ এই আনন্দোৎসবে প্রধানের আবির্ভাব। সে অনেকটা অপ্রকৃতিস্থ হলেও সব বুঝতে পারে। সকলে মিলে জোর প্রতিরোধের সন্দ্বকল্প নেয়। এখানেই নাটকের সমাপ্তি।

৪৮.৫ সারাংশ

'অরণি' পত্রিকায় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'নবান্ন প্রকাশের পর ১৯৪৪-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। জ্ল১৯৩৯-৪৫ৰ। ভারত বর্ষের রাজনীতিতে এসময়ের মধ্যে আগস্ট আন্দোলন হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের সমস্ত প্রথম শ্রেণীর নেতা-নেত্রী কারান্তরালে। দক্ষিণ বন্দেগ বিশেষত মেদিনীপুরে স্বাধীন সরকার গঠন করা হয়েছে। সেইসন্দেগ চলছে সমস্ত দেশ ব্যাপী বিশেষ করে মেদিনীপুর অঞ্চলে শাসক ইংরেজদের সীমাহীন পীড়ন। জাপানী আক্রমণের ভয়ে দেশের ভিতর 'পোড়ামাটি নীতি' ঘোষিত হয়েছে। এই ৪২ আক্টোবর মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনার একাংশ সাইক্লোন, জলো২৬৩াস ও বন্যায় বিপর্যস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেশ বাসীর জীবনে নিয়ে এসেছে মন্বন্তর। বাঙলাদেশের ১৫ লক্ষ মানুষ এসময় অনাহারে মৃত্যু বরণ করে। জোতদার-মজুতদার এর সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচার শোষণ করেচ 'নবান্ন' সমাজের সেই বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। 'নবান্ন' নাটকের বিষয় বস্তু পর্যালোচনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়।

'নবান্ন' এর বিষয় বস্তু গ্রাম বাংলার সাধারণ কৃষকের জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে সর্বস্বান্ত কৃষক জীবনের কথাই এর মূল প্রতিপাদ্য। এর সন্দেগ যুশু হয়েছে দেশীয় জোতদার-মজুতদারের ভয়ন্দ্বকরতম শোষণ ও সেই সন্দেগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ—সব মিলিয়ে একটা সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশ এ নাটকের প্রেক্ষাপট।

এদিক থেকে 'নবান্ন'-এর বিষয় বস্তু অভিনব। মন্বন্তর তো শুধু দুর্ভিক্ষ নয়, মারী-হাহাকার তার নিত্যসন্দগী। এই দুঃখ দুর্দশায় আমিনপুরের সমাদ্দার পরিবার তথা বাংলার বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ কৃষক পরিবার প্রাণধারণের প্রয়োজনে নিজ বাসগৃহ ছেড়ে শহর কোলকাতার রুক্ষ পাষাণ প্রান্তরে আছড়ে পড়েছে। নাটকে তাদেরই জীবন বৃত্ত রুপায়িত হয়েছে। শহরের সম্পন্ন গৃহস্টথ এই দুঃস্টথ মানুষগুলির প্রতি যে নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়েছে, তা উভয়ের শ্রেণীগত ভিন্নতার পরিচয় দেয়। এর প্রতিকার কামনায় বিপর্যস্ত ক্ষুধার্ত মানুষগুলি সার্বিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার শপথ নিয়ে গাঁতায় চাষ ও ধর্মগোলার ব্যবস্টথা করেছে। তারা জোটবদ্ধতার শপথ নেয়। এভাবেই নবান্ন হয়ে উঠেছে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক।

৪৮.৬ অনুশীলনী ১

১। 'নবান্ন' নাটকের অভিনবত্ব সম্পর্কে অন্তত দুটি উদাহরণ দিন।

২। 'নবান্ন' নাটকের প্রথম প্রকাশ ও প্রথম অভিনয়ের তারিখ লিখুন।

৩। বাংলার কৃষক জীবন নিয়ে রচিত তিনটি নাটক ও তার নাট্যকারের নাম লিখুন।

৪। 'নবান্ন' নাটকের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫।'নবান্ন' নাটকের নামকরণের তাৎপর্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪৮.৭ 'নবান্ন' নাটকের প্রাসন্দিগক আলোচনা

'নবান্ন' নাটকের প্রথম অন্দেকর প্রথম দৃশ্যে আগস্ট আন্দ্রোলন ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি র কঠোর দমনপীড়নের বর্ণনা। এই সময় প্রধান হারাল তার সংগঠক স্ত্রী পঞ্চাননীকে। বন্যায় এবং হারু দত্তের অত্যাচারে হারাল নাতি মাখন এবং আমিনপুরকে। সমস্ত ঘর-গেরস্থালী ছেড়ে সমাদ্দার পরিবার শহরের পথে পার্কে ভিখারীর জীবন যাপন করতে থাকল। এখান থেকেই বিনোদিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল মূল দল থেকে। তারপর সরে গেল কুঞ্জ, রাধিকাচ সকলকে হারিয়ে শহরের গোলোকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে খেতে প্রধানের পুনরায় প্রত্যাবর্তন ঘটল গ্রামে। এটাই নবান্ন নাটকের মূল ধারা। কিন্তু এই মূল ঘটনাবলী বর্তুল-আকারে ও প্রায় সংঘাতবিহীন ভাবে ঘটেছে। এর মধ্যে কারুণ্য থাকলেও কোনো দ্বন্দ্বও নেই এমনকি বৈচিত্র্য নেই বললেও চলে। অথচ মূল ধারা থেকে প্রথম যে শাখাটি বেরিয়ে এসেছে—বিনোদিনী যে অংশের প্রধান—স্বামী নিরঞ্জনের সন্দেগ মিলিত হয়ে জুমিলনটা অতর্কিতৰ যে ঘটনাটি ঘটিয়েছে সেটা কিছুটা চমকপ্রদ। হারু দত্ত দুষ্ট প্রকৃতির, অত্যাচারী, তার অত্যাচারে প্রধান পরিবার গৃহহারা, দেশছাড়া। ধান চালের চোরাচালানকারী, মুনাফাখোর অসৎ চরিত্র, মেয়ে পাচারকারী, এক কথায় ভিলেন বা খল চরিত্র। কালীধন চালের ব্যবসাদার। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে ও যুদ্ধের বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অতিরিশু মুনাফার ফাঁপানো ব্যবসা চালাচ্ছে এবং সেইসন্দেগ সেবাশ্রমের ব্যবসাকেও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিয়েছে। এরা সবাই মুনাফা লুটছে, রাজনৈতিক ঝড়ো হাওয়া, বন্যা আর দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে ফুলে, ফেঁপে একশা হয়ে গেছে। নাটকটি যদি এদের বিরুদ্ধেসংগ্রামের নাটক হত তাহলে দ্বিতীয় অন্দেকর সমাপ্তিতে নাটকের সমাপ্তি ঘটত। কেন না, এই অন্দেকর শেষে হারু দত্ত কালীধন স্বরূপে প্রকাশ হয়ে গেছে। বিনোদিনী নিরঞ্জনের সশ্লি য় চেষ্টায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। প্রথম অন্দেকর শেষ দৃশ্যে হারু দত্ত যে অত্যাচার চালিয়ে দর্শকমনে উষ্মার ক্রোধাগ্নি প্রলিত করেছিল, দ্বিতীয় অন্দেকর পঞ্চম দৃশ্যে তাদের হাতে হাতকড়ি পরাতে পেরে নিরঞ্জন বিনোদিনী খুব তৃপ্তি পেয়েছে, সেই সন্দেগ দর্শকও খুশি হয়েছে এবং নিরঞ্জন বিনোদিনীর আমিনপুরে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু আছর্যের বিষয় অত্যাচারিত হয়েছে যারা, প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত যারা সেই কুঞ্জ রাধিকা, প্রধান এসবের বাইরে থাকল। তারা এসবের বিজ্ঞুবিসর্গ জানতে পারল না। তার ফলে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা গুরুত্ব হারিয়ে 'নবান্ন' নাটকের ঘটনাংশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকল মাত্র। সাধারণত, প্রতিবাদ প্রতিরোধের নাটকে ঘটনাক্রম অগ্রবর্তী হয় এই রকমভাবে—অত্যাচারীর অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ সন্দ্বঘবদ্ধহয়, তারপর তাকে ধবংস করে ফেলবার জন্য প্রস্তুত হয়। শেষে সন্দ্বঘবদ্ধশক্তি র উদ্বোধন ঘটিয়ে তার সন্দেগ সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং উদ্বোধিত শক্তি র আঘাতে অত্যাচারীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তারপর আর নাটককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়। নাটকের গঠনশৈলী তাহলে শিথিল হয়ে পড়বে। ঘনসন্নিবদ্ধ রূপটা নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু আছর্যের বিষয় 'নবান্ন' নাটক তারপরও এগিয়েছে এবং জনচিত্তে আলোড়ন তুলে জমজমাটি রুপটা পরিপূর্ণভাবে বজায় রেখেছে। এই প্রসন্দেগ শ্রীশম্ভু মিত্রের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ। তিনি বলেন— 'নবান্ন' এর আগে আমাদের সব ট্রাজেডিই ডোমেস্টিক ট্রাজেডি। 'নবান্ন'-এ এল এপিক নাটকের ব্যাপ্তি। এ নাটকে প্রধানের সংসার সেন্ট্রাল নয়। এর মধ্যে ছিল পোয়েট্রি অব মোমেন্টস। আমরা দৃশ্যের সন্দেগ দৃশ্য জুড়েছিলাম ওয়েলিং দিয়ে। হার্ট-রেনডিং 'ফ্যান দাও চিৎকার দিয়ে। র' রুডনেস থেকে পোয়েট্রি উঠে আসত। একটা দৃশ্যে কুঞ্জকে কুকুরে কামড়েছে। শোভা কুকুরকে লক্ষ্য করে ওয়াইলডলি শাউট করে তারপরই সফটলি বলে ছ জল খাবে? তেষ্টা পেয়েছে? মহর্ষি এই দৃশ্য দেখে বলেছিলেন, 'এটা শাশ্বত'।

আর এক জায়গায় বলেছেন—নাটকটির একটা এপিসোডিক কারেকটার আছে। সম্পাদনায় একটু গোছানো হলেও, একটু সংহত হলেও সে কারেকটার বজায় রাখা ছিল। সম্পাদনায় দৃশ্যগুলি এমন ভাবে রাখা হয়েছিল, যাতে এক একটি এপিসোডের এক একটি ক্লাইম্যাকস প্রতিটি দৃশ্যের শেষে আসে। প্রযোজনায় এই ক্লাইম্যাকসকে তীক্ষ্ণ করার চেষ্টা ছিল। কলকাতায় আসার পর থেকে দুই দৃশ্যের মাঝখানে 'ফ্যান দাও', 'একটু ফ্যান দাও' এই আর্ত কোরাস নেপথ্যে শোনা যেত। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত পথেঘাটে এই আর্ত চীৎকার ভীষণভাবে শোনা যেত। দর্শকের কানে এটা টাটকা ছিল, দারুণ জীবন্ত ছিল।

দ্বিতীয় অন্দ্বেকর পর 'নবান্ন' নাটক ক্রমঅগ্রবর্তী হওয়ার পক্ষে শ্রীশম্ভু মিত্রের বশু ব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে তাঁর বশু ব্যে প্রয়োগচাতুর্যের দিকটা গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। আমরা তাঁর বশু ব্য স্মরণে রেখে 'নবান্ন' নাটকের ঘটনা বলীকে একটু বিশ্লেষণ করে অন্য কিছুর হদিস পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করব।

নাট্যকার হারু দত্ত ও কালীধন ধাড়াকে প্রত্যক্ষত জনশত্রু হিসেবে ধরেছেন ঠিক। কিন্তু তিনি তাদেরকেই বড় করে দেখাতে চাননি, মানে একমাত্র নেগেটিভ ফোর্স হিসেবে দেখিয়ে তাদের ধবংস করাটাই বড় কাজ বলে মনে করেননি। তিনি এদেরকে একটি ক্ষুদ্র শশ্তি সম্পন্ন সামান্য শত্রু বলে ধরে নিয়ে তাদের জন্য সৈন্য বাহিনীর একটি অতি ক্ষুদ্রাংশ নিয়োজিত করে পরাজিত করতে চেয়েছেন। ঘটনাটা যেমন ভাবে ঘটেছে তাতে এরকমটা মনে করবার যথেষ্ট কারণ বর্তমান । কিন্তু তাহলে একটি প্রশ্ন থেকে যায়চ নাটকের প্রধান প্রতিপক্ষ কে? নাটক মানেই সংঘাত। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সংঘাতের ক্ষেত্র রচিত হয়। আর তার ফলে নাটকে এসে পড়ে একটি অনিবার্য গতিবেগ, তরতর করে নাটক ছুটে চলে। কিন্তু কালীধন, হারুদত্তের মতো প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষের পতনের পর নাট্যকার কাকে প্রতিপক্ষ করে পরবর্তী দুটি অন্দ্বক পর্যন্ত নাটকে টেনে নিয়ে গেলেন—এ প্রশ্ন স্বভাবত না জেগে পারে না। নাট্যকার পৌঁছতে চান নবান্নের উৎসব দিনে, যে দিনটিতে সকলের প্রত্যাবর্তন ঘটবে এবং সকলের মিলনে উৎসব হয়ে উঠবে প্রাণ অপূর্ব রসে সঞ্জীবিত। এই উৎসব মুখর দিনে সকলে শপথ নেবে প্রতিরোধের, আকালের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শপথ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রধান প্রতিপক্ষ কালীধন হারু দত্ত নয়, প্রধান প্রতিপক্ষ আকাল। এখন এই আকাল ব্যাপারটি কি একটু জানা দরকার। আকাল -এর আভিধানিক অর্থ দুঃসময়। যা মানুষের দুঃখ দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থায় 'নবান্ন' রচনাকালে চলছিল এক চরম সন্দ্বকট। একদল মানুষের অর্থগৃধ্নুতা,

শক্তি র দম্ভ এ বং প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা র অশুভ বাসনা টেনে এনেছিল যে বিশ্বযুদ্ধ, তা র ফলে বিশ্বে র কতিপয় দেশে র সন্দেগ ভা রত বর্ষেও নেমে এসেছিল ভয়ন্দ্বক র অর্থনৈতিক সংকট। জনজী বন হয়ে পড়েছিল বিপর্যস্ত। গ্রামে র সুস্নিগ্ধ জী বন প্র বাহে ঘটে গিয়েছিল অ বাঞ্ছিত ছন্দ্রুপতন। দ্বিতীয়ত, দেশীয় সমাজ ব্য বস্টথাকে বিশৃঙ্খলা কর তোল বা র জন্য শোষক সম্প্রদায়ে র ষড়যন্ত্রমূলক অভিসন্ধি র ফলে এসে গেল আন্দ্রোলন। তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়— তা র ফলে দেশে দেখা দিল ভয়া বহ বন্যা। এই বন্যা র দুর্বিপাকে মানুষ হয়ে পড়ল একান্ত অসহায়। মানুষে র খাদ্যশস্য রাতে র অন্ধকা রে চলে যেতে লাগল ব্য বসায়ী র গুদামে। কৃত্রিমভা বে দুর্ভিক্ষকে তী ব্রত র ও দীর্ঘত র কর তোল বা র প্রয়াস পেলেন অসাধু ব্যশ্তি বর্গ, তা রা খাদ্যশস্যে র অহেতুক অপচয় ঘটাতে লাগলেন নানা উপায়ে। এমন কি বস্তা বস্তা খাদ্যদ্র ব্য গন্দ্বগা র জলে ফেলে দেওয়া র খ ব রও পাওয়া যেতে লাগল। এ স ব কিছু র একটাই উদ্দেশ্য কৃত্রিম সন্দ্বকট তৈরি ক রা। স ব মিলিয়ে দেখা গেল দেশে র বুকে একটা চ রম দুঃসময় বি রাজমান অর্থাৎ আকাল এসে মানুষে র জী বনকে তছনছ করে দিতে লাগল। নাট্যকা র সেই বিষয়গুলিকে একে একে তুলে ধ রেছেন নাট্যান্দ্বিগকে। এ বং উপরি-উল্লিখিত বিষয়গুলি র সম্মিলিত দুছেষ্টায় জনজী বনে এসে পড়া আকালকে প্রতিপক্ষ করে তা র বি রুদ্ধে প্রতি রোধ গড়ে তুলতে চেয়েছেন নাট্যকা র। এই যে বি রাট শত্রু বা দৃশ্য নয় অথচ যা র জঘন্য আত্মপ্রকাশ ঘটছে জনজী বনকে বিপর্যস্ত করে তুল বা র জন্য, মানুষে র সংসা রে র শান্তি, জী বনে র সুখকে বাজপাখি র মতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাওয়া র জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তা র সন্দেগ লড়াই ক রতে হবে। যে শত্রু প্রত্যক্ষ এ বং নাগালে র মধ্যে তাকে শায়েস্তা ক রা যায় সহজে। তাই কালীধন, হা রু দত্তেরা অতি সহজে ধ রা পড়ে। তা রা এতো সহজে এ বং এতো সত্ব র ধ রা পড়ায় অনেকে আছর্য হতে পা রেন, কিন্তু নাট্যকা র অতি সুচ্ছ্র রভা বে প্রত্যক্ষ শত্রুকে প রাস্ত ক র বা র ব্য বস্টথা করে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে প্রত্যক্ষ শত্রুকে প রাস্ত ক রা যায়। কিন্তু যে শত্রু অপ্রত্যক্ষে থেকে সমাজে র ক্ষতি করে যায়, প্রথমে তাকে চিহ্নিত ক রা র প্রয়োজন আছে। তাই এই আকালে স র্বস্ব হা রিয়ে এই গ্রাম্য জনতা এটুকু বুঝেছে যে আ র একটা আকালে র প্র বেশে র পথ বন্ধ ক রতে হবে। তা র বি রুদ্ধেলড়াই ক র বা র জন্য বি রাট প্রতিরোধ বাহিনী গড় বা র দ রকা র আছে। তাই নাট্যকা র একে একে আকাল সৃষ্টিকা রী অশুভ শক্তি র স্ব রুপ উদঘাটন করে গেছেন প্রথম পর্যায়ে। তিনি দেখিয়েছেন কালো বাজা রী, চো রাকা র বা রীদে র চরিত্র, তিনি দেখিয়েছেন বস্ত্রহীন, শতছিন্ন নোং রা কাপড়ে র টুকরো পরিহিত ক্ষুধার্ত নগ্ন ন রনা রী র ছবি তুলে একদল অসৎ সং বাদজী বী এ বং ফটোগ্রাফা র রা পয়সা র লোভে বিদেশে র খ বরে র কাগজে তা বিক্রি করেছে, বিনিময়ে আর্ত জনতা র মুখে র ওপ র ছুঁড়ে দিছে দু-চা র আনা পয়সা। নাট্যকা র দেখিয়েছেন, যে যুদ্ধের ব্য াপক জনতা র কোনো সম্পর্ক নেই সেই যুদ্ধকা র মন্দ্বগলে র জন্য? যুদ্ধ কিসে র জন্য এ বোধ যাদে র নেই সেই স ব মানুষদে র ধরে ধরে যুদ্ধে সাপ্লাই ক রছে একদল অর্থলোভী কন্ট্রাকট র। তিনি দেখিয়েছেন পু রুষে র লালসা মেটা বা র জন্য অসহায় ফুটপাত বাসী সোমথ না রীদে র ভুলিয়ে নিয়ে যাছে মায়ে র বুক খালি করে। তিনি দেখিয়েছেন হাসপাতালে র শোচনীয় ক্রিয়াকাণ্ড। স ব মিলিয়ে দেশে র একটা ভয়া বহ ছবি তুলে ধ রেছেন নাট্যকা র। এস ব দেখা বা র উদ্দেশ্য মানুষকে সচেতন করে তোলা। শুধু সচেতন নয় একটা প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোল বা র

পজিটিভ ইন্দিগতেও তিনি রেখেছেন তার নাটকে। আগামী দিনে আবার যদি আকাল আসে তবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। নাট্যকার সে কথা ব্যঞ্জ করেছেন দয়ালের মুখ দিয়ে, 'কিন্তু এ কথাও জেনো প্রধান, সে গত বারের মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন চ আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব জ্ঞজনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়েব এই এরাই তো আমার আত্মীয় পরিজন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের। কিছুতেই না। এদের নিতে হলে আগে আমাকে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে হবে, এট্টা ব্যবস্থার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে, তবে যদি পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবারঙ্গ জোর প্রতিরোধঙ্গ—এ প্রতিরোধ আকালের বিরুদ্ধে। প্রতিরোধ মূলক নাটকে তাই স্থান কাল পাত্রের সুসন্দগতি, ঘটনার যুক্তি সন্দগত বিন্যাস, ঘাত-প্রতিঘাতের টানাপোড়েন এবং তীব্র নাটকীয় দ্বজ্ঞত সব সময় সঠিকভাবে পাওয়া যাবেই এমন কথা বলা যায়না। 'নবান্ন' নাটকে সে হিসেবে গঠনগত দিক থেকে অল্পস্বল্প ত্রুটি থেকে গেছে। নাট্য সমালোচকের চোখে সে ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা সহজেই পড়ে যাবে। কিন্তু 'নবান্ন' নাটকের বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে অন্য রকম ভাবে। গতানুগতিক নাটক আর গণচেতনা বৃদ্ধির জন্য গণমঞ্চের নাটকের একটা স্পষ্টরেখ পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যসূত্রে নাটকে একটা বিপ্লবাত্মক বক্তব্য এসে পড়েই এবং আকস্মিকতার একটা সন্দগতিবিহীন চমক না থেকে যায়না। এ গুলিকে সমালোচনার খাতিরে শৈল্পিক ত্রুটি হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমন বিভিন্ন দৃশ্য পারস্পর্যবিহীন এক একটি চিত্র ফুটে উঠতে দেখা গেছে। এই সব চিত্রগুলি যদি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হত তাহলে খুব ভাল হতো। নাটকের ঘটনা বলী একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলবে এবং প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা জাগিয়ে রেখে একটা সংঘাত সৃষ্টি করে পরিণতি প্রাপ্ত হবে এটাই বাঞ্ছনীয়। তবে আমরা পূর্বের কথার জের টেনেও বলতে পারি গণনাটকের বিচার বিশ্লেষণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভন্দিগতেই করতে হয়। প্রসন্দগক্রমে 'নীলদর্পণ'-এর কথাটা এসে পড়ে, আর নীলদর্পণে একটা প্রচারের দিক থাকা সত্ত্বেও নাটকটি অনেক বেশি নাট্যগুণসম্পন্ন। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু ভাববার দরকার আছে। কেন না, 'নীলদর্পণ' প্রথমত গণনাটক নয়। দ্বিতীয়ত, কৃষকদের কথাই এই নাটকের একমাত্র বক্তব্য বটে তবে তারাই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, তা যদি হত নবীন মাধব নায়ক আর তার পরিবারের বিষাদময় পরিণতিতে নাটকের সমাপ্তি এটা হতে পারত না। শিথিল অর্থে নাটকের মধ্যে যেটুকু ট্রজেডির চেহারা দেখা গেছে, তা গোলোক বসুর পরিবারের ট্রজেডি হয়ে গেছে। সমস্ত কৃষক পরিবারের ট্রজেডি হয়ে উঠতে পারেনি।

তাহলে প্রশ্ন, 'নবান্ন' নাটকে কি সেই ট্রাজেডির কোনো ব্যত্যয় ঘটেছে? বিষয়টা একটু ভেবে দেখে যেতে পারে। প্রধান সমাদ্দারের পরিবার এই নাটকের কেন্দ্রীয় পরিবার। এই পরিবারের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণই বেশি। নাটকে দৃশ্যত উদ্বাস্তু হয়েছে এই পরিবারটিই, এই গ্রাম্য পরিবারটির একটা বিপ্লবাত্মক ভূমিকাও আছে। প্রথম দৃশ্যে কুঞ্জ আর প্রধানের সংলাপ ,পরে প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননীর প্রতিরোধমূলক ভূমিকা, আর তা করতে গিয়ে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এই পরিবারের বৈপ্লবিক ভূমিকাটি তুলে ধরা হয়েছে। তারপর এই পরিবারটিই ভিখিরিতে পরিণত হল, এবং সমাপ্তি পর্বে আবার মিলনের বিজ্ঞুতে সংস্থিত হল, সব মিলিয়ে আপাতদৃষ্টিতে

মনে হতে পারে এই সমাদ্দার পরিবারটিই 'নবান্ন' নাটকের একটা ট্রাজিক বাতাবরণ তৈরি করেছে। আবার প্রধান সমাদ্দারের দিকে লক্ষ্য রেখে একথা ভাববার একটুখানি সুযোগ থেকে যায় যে ব্যক্তি ট্রাজেডির একটি বুদবুদ। কিন্তু ব্যক্তির ট্র্যাজেডি হতে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি টিকে যে দৃঢ়ভূমির ওপর দাঁড় করান দরকার নাট্যকার তা করতে পারেননি। অপরপক্ষে চরিত্রটি গভীর থেকে গভীরতর তলদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। বিষাদের ঘণীভূত রুপটা তার মধ্যে দেখা যায়নি। ফলে দর্শকমনে একযোগে ভয় ও করুণা জাগেনা। বরং পাগলামোর একটা হালকা আবরণ জড়িয়ে এবং কখনো কখনো আকস্মিকতা দোষে দুষ্ট করে চরিত্রটা তরল করে ফেলা হয়েছে। সব মিলিয়ে একটা অসংগত অবাস্তব পাগলামো প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও প্রধান অনেকটা 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশের অতিনাটকীয় ভূমিকার শিকার। অনেকদিক থেকে উভয়ের মিল থাকলেও আসল কথা এই যে 'নবান্ন' নাটকের প্রধান পরিবার বা প্রধান চরিত্রটি সেন্ট্রাল নয়। গোটা সমাজের ছবিটা ফুটিয়ে তোলাই এই নাটকের উদ্দেশ্য। ডোমেস্টিক বা পারিবারিক ট্রজেডি সৃষ্টির কোনো ইচ্ছা নাট্যকারের এখানে ছিলনা। আগষ্ট আন্দোলন বন্যা-বিশ্বযুদ্ধ— এই তিন বস্তুর সমবায়ে আগত আকালের কবলিত হয়ে কৃষক সাধারণের জীবনে যে ছন্দ্রপতন ঘটে গেছে, যে ক্ষয়ক্ষতি, দুঃখদুর্দশা নেমে এসেছে তাতে শান্ত স্নিগ্ধ গ্রাম্যজীবনের চালচিত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আশা-আকান্দ্বক্ষা, সাধ-স্বপ্নের ওপর আকস্মিক আঘাত এসে গোটা সমাজের চেহারাটা দিয়েছে বদলিয়ে কোনো ব্যক্তি নয়, কোনো বিশেষ পরিবার নয়, সমস্ত কৃষক সমাজ সমস্ত গ্রাম্যজনতার জীবন দুঃখ, দুর্দশা হাহাকারে ভরে গেছে। শুধুমাত্র প্রধান সমাদ্দার বা তার পরিবারটাই ছিন্নমূল হয়ে শহরের পথে ছেঁড়া কাপড় আর একপেট বুভুক্ষা নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি। সমস্ত কৃষক সমজই হয়েছে ক্ষতিগ্রত, তাই এই সব দিকে তাকিয়ে ব্যাপক অর্থে আমরা 'নবান্ন' নাটককে সামাজিক ট্রাজিডি মনে করতে পারি। তবে প্রসন্দ্বগক্রমে বলে রাখা ভাল যে সঠিক অর্থে ট্রাজেডি লক্ষণাক্রান্ত নাটক বাংলায় বিরল। না থাকবার কারণটাও অবিদিত নয়। দ্রুত পরিবর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ট্রাজেডি হতে পারেনা। আবার ব্যক্তির ট্রাজেডির জন্য যে ব্যক্তি ত্বশালী পুরুষের দরকার তেমন পুরুষ বিরল। এসব দিক বিচার করলে বলা যায় 'নবান্ন' নাটক ট্রাজেডির নাটক নয়। 'নবান্ন' ছোট ছোট ঘটনার, ছোট ছোট চিত্রের নাটক। 'নবান্ন' প্রতিবার প্রতিরোধের নাটক।

এই নাটক সম্পর্কে আরো একটু বলবার কথা এই যে, নাটকীয় চমক সৃষ্টির দিকে নাট্যকার অতিরিশু মনোনিবেশ করেছিলেন। নতুন বশু ব্য, জীবনবোধ নিয়ে ভিন্ন ধরনের দর্শক আকর্ষণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে প্রযোজনা, সেক্ষেত্রে এ ঘটনা কিছুটা স্বাভাবিক ছিল। তার ফলে যে বিষয়-পরম্পরায় গোটা নাটকের সন্ধিগুলো অগ্রগামী হয়ে নাটকের সুষম সমাপ্তি ঘটে, সে নিয়ম পরম্পরা সব সময় বজায় থাকেনি। বস্তুত নাটকটির প্রতিটি দৃশ্য চমক বিশিষ্ট। প্রত্যেকটা দৃশ্যের শেষে অতর্কিত চমকসৃষ্টির একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাতে দর্শক সাধারণের উপভোগ্যতা বহুগুণ বেড়ে যায় ঠিক কিন্তু তাতে গোট নাটকে যে উৎকণ্ঠা বজায় থাকবার কথা সেটি থাকেন। কালীধন ধাড়া হারু দত্ত পর্যন্ত একটা Dramatic Suspense বজায় ছিল। কিন্তু তাদের হাতে হাতকড়ি পড়বার পর নাটকে সে উৎকণ্ঠা আর বজায় থাকেনি। ফলত নাটকে গতিপ্রবাহের তীব্রতা

সৃষ্টির পরিবর্তে কেবলমাত্র কয়েকটি সমাজচিত্র তুলে ধরবার চেষ্টার প্রতি একাগ্রতা লক্ষ্য করা গেছে।

৪৮.৮ 'নবান্ন' নাটকের গঠন

কোনো কাহিনীকে নাটক করে তুলতে গেলে গোটা কাহিনীকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে নিতে হয়। সাধারণত পাঁচটি ভাগে এই স্তর বিন্যাস হয়ে থাকে । নাটকের পরিভাষায় একে বলা হয় পঞ্চসন্ধি। একটি পূর্ণাঙ্গ বড় নাটকে এই পাঁচ স্তর বা পঞ্চসন্ধির কড়াকড়ি নিয়ম নিয়ে কাহিনীকে নাটক হিসেবে গড়ে তোলা হয়। সর্বাধুনিক বাংলা নাটকের পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়মে নাটক গ্রন্থি বদ্ধহত। কিন্তু আধুনিক নাটকে এই নিয়মের কড়াকড়ি থাকল না। নাটক আকারে এবং প্রকারে ছোট হয়ে আসবার ফলে আধুনিক নাট্যকারগণ গোটা নাটকটিকে তিনটিকে স্তরে ভাগ করে নিলেন। এই স্তর বিন্যাসের সংক্ষিপ্তকরণের কারণটা অনুসন্ধানটা করা যেতে পারে। শুধুমাত্র আকারে এবং প্রকারে ছোট হয়ে যাওয়াটাই বোধ হয় একমাত্র কারণ নয়। গ্রীক নাটকে গুরুত্ব পেত বিষয় বস্তু। তাই গ্রীক নাটককে বিষয় প্রধান বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু সেক্সপীয়রের নাটকে বিষয়টা প্রধান হলনা। প্রধান হল চরিত্র। এই ধারা বয়ে চলল দীর্ঘদিন। বাংলা নাটকের যে যুগটাকে স্বর্ণ যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে অর্থাৎ গিরিশ-অর্ধেন্দু-শিশির-অহীন্দ্র যুগ পর্যন্ত নাটকে প্রধান হয়ে দেখা দিল চরিত্র। যার জন্য প্রায় প্রত্যেকটা নাটকে এমন একজন চরিত্র অন্দিকত করা হতে থাকল যাতে অভিনয় করবেন কোনো প্রতিষ্ঠিত নট বা নটী। তাদের অভিনয় সাফল্যের সন্দেগ নাটকের সাফল্য ছিল নির্ভরশীল।

আধুনিক কালের বাংলা নাটক দুটি ধারায় বয়ে চলে। একটিতে মনস্তত্তের প্রাধান্য পুরোপুরি বজায় থাকে। অপর ধারাটি গণনাটকের খাত বেয়ে গণচেতনা বৃদ্ধি, যে গণচেতনা সমাজ পরিবর্তনের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহন করবে— সেই দিকে এগিয়ে যায়। গণনাটকে তাই ব্যক্তি র ব্যক্তি ত্ব এবং মনস্তত্ত্বের সংমিশ্রিত রূপেই পরিবর্তন ঘটে গেল। নাটকে এসে গেল শোষক শোষিতের সংঘাত মুখর সম্বন্ধ। অর্থাৎ শ্রেণী দ্বন্দ্ব। তাই ব্যক্তি রই হোক বা মনস্তত্তের রই হোক একক প্রাধান্য বজায় থাকল না। প্রধান হয়ে উঠলো গোটা সমাজ। সমাজে একক ব্যক্তি র ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। তাই ব্যক্তি প্রধান্যের স্টথলে সমষ্টি প্রাধান্য সাব্যস্ত হল। সমষ্টি বলতে এখানে বলা হয়েছে শোষিত গোষ্ঠী। শোষিত গোষ্ঠীর সংখ্যা বিপুল, তাই বিপুল সংখ্যক মানুষের কথা বলবার জন্য গণনাটক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। তাই গণনাটকে আমরা দেখলাম প্রতিরোধ আর সংগ্রামের প্রতিছবি। তাই এই ধরনের নাটককে বলা হয় প্রতিবাদের নাটক বা Drama of Protest।

'নবান্ন' নাটক Drama of Acceptance বা Interjection অথবা Discomfort নয়, অথবা Frustration কিংবা Drama of Chaos অথবা Absured- ও নয়। 'নবান্ন' প্রতিবাদের নাটক, প্রতিরোধের নাটক,Drama of Protest বা Drama of Revolt বলা যেতে পারে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধের মনোভাবটাই এই নাটকের মূল সেন্টিমেন্ট। সুতরাং এই নাটকে ব্যক্তি মনস্তত্তের বক্রগামী রেখাচিত্রের শিল্পসম্মত রূপায়ণ মূল লক্ষ্য নয়, জনগণের দুঃখ দুর্দশার কারণগুলো বিশ্লেষণ করে বিরুদ্ধশক্তি র বিরুদ্ধেএকটা প্রতিরোধ গড়ে

তুলে জনগণকে প্রতিবাদের স্তরে নিয়ে যাওয়াই মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। আর তারপর প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে কাঙ্খিত মুক্তির শীর্ষবিন্দুটি স্পর্শ করবার পজিটিভ ইন্দ্বিগতের মধ্যে দিয়ে নাটকটির অভীষ্ট পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। 'নবান্ন' নাটক এই ধ্যানধারণার সরিক।

সুতরাং এই ধরনের নাটকের স্তর-বিন্যাসেও অনিবার্য ভাবে এসে যায় কিছু অদল বদল। নাটকের গতানুগতিক ঠিকুজি-কুষ্ঠিটা ছিঁড়ে যায়। নাটক যেহেতু প্রত্যক্ষ জীবনের রণক্ষেত্র থেকে উঠে আসে, তাই তার সুরটা হয় চড়া। চড়া সুরকে দীর্ঘতর করলে অনুচিত ফলের সম্বাবনা দেখা দিতে পারে, তাই নাট্যকার পাঁচটি স্তরের পরিবর্তে কেউ তিনটি,কেউ চারটি স্তরে সমস্ত নাটকটি বিন্যস্ত করেন। একেবারে ছোট নাটক তিনটি স্তরে। একটু বড় নাটককে চারটি স্তরে ভাগ করে নিয়ে নাটক গড়ে তোলবার আধুনিক ইঙ্গিতটাই অধিক কার্যকরী হয়ে উঠতে দেখা যায়। 'নবান্ন' নাটক বড় নাটক, তাই এই নাটকটি চারটি স্তরে বিন্যস্ত হয়েছে বলা যেতে পারে।

'নবান্ন' নাটকের উৎসমুখ উৎসারিত হয়েছে প্রথম অন্দ্বেকর প্রথম দৃশ্যে। প্রথম অন্দ্বেগর প্রথম দৃশ্যে দেখান হয়েছে স্বাধীনতার আন্দ্রোলন আর তার ফলস্বরুপ আমিনপুর গ্রামের ক্ষয়ক্ষতি। তারপর দেখান হয়েছে প্রধান পরিবারের সাংসারিক জীবনযাত্রা এবং অনতিবিলম্বে বন্যার ভয়াবহ আক্রমণে গোটা আমিনপুরের সাধারণ মানুষের জীবনের বিপর্যয়ের চিত্র। সেই সন্দ্বেগ মহামারীর ব্যাপক আক্রমণে সহায়সম্বলহীন মানুষের মৃত্যুর সন্দ্বেগ, খাদ্যাভাবের সংগ্রামের চিত্র। এরই সন্দ্বেগ অসৎ ধনীর অর্থগৃধ্নুতা, লোলুপতার নগ্ন চিত্র অন্দ্বিকত হয়ে উঠতে থাকল বীভৎসভাবে। প্রথম অন্দ্বেকর তৃতীয় দৃশ্যে বন্যাচ ঘর বাড়ি মানুষজন জীবজন্তুকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে সমস্ত আমিনপুরকে সমুদ্রে পরিণত করে ফেলেছে। .....সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল.....সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙা র মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মাঙ্গ তার পরের দৃশ্যে বন্যাবিধবস্ত অঞ্চলে খাদ্যাভাবে এবং রোগ অসুখের চিত্র অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত। তারপরের দৃশ্যে পয়সাওয়ালা মানুষের জমি আত্মসাতের অপকৌশলের, লোলুপ দৃষ্টির অবলেহনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই দৃশ্যে সমাদ্দার পরিবার, হারু দত্তও তার লোকজনদের নির্মম অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে শহরে। এই দৃশ্যেই ঘটেছে মাখনের মৃত্যু।

নাটক এরপর উঠতে থাকে ওপরে। দ্রুতগতিতে রাইজিং এ্যাকসনের স্তর ছেড়ে ক্লাইমেক্স-এর স্তরে পৌঁছতে চায় নাটক। প্রথম দৃশ্যে নারীর ইজ্জত রক্ষা দেশে সন্দ্বকটত্রাণ সাম্রাজ্যবাদীর পাশবিক শক্তির ব্রিটিশ দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বস্তুত কেড়ে নিল পঞ্চাননীকে। তৃতীয় দৃশ্যে বন্যা নিল প্রধানের প্রতিবেশী দয়ালের স্ত্রী এবং তার একমাত্র সন্তানকে রাঙা, রাঙার মা। কিন্তু তবুও আমিনপুরের মনোবলটা ভেঙে পড়েনি। তবুও উনানের ধোঁয়া উড়ল। শাকপাতা সেদ্ধ করে মানুষগুলো বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে লাগল আপন বাস্তুভিটার মাটিটুকু আঁকড়ে। তবে খেত-খামার খাল-বিলের শাকপাতা জগডুমুর আর কুচো কাঁকড় দিয়ে কদিনেই বা চলে, আর ওই বস্তুগুলো অত অপর্যাপ্তই বা কোথায়ঙ্গ তাছাড়া ঘাসেরও দাম বেড়ে গেছে দুর্ভিক্ষের বাজারে। 'এ যেন আমার ঢোলকলমি জলার ঘাস বলে মনে হচ্ছেঙ্গ তা সে যা করেছ করেছ,

আর কেটো না। ঘাসের আজকাল বড্ডদর।'ডহারু দত্তছ ১ম অন্দক, পঞ্চম দৃশ্য] প্রধান ঠিক করে জমি বিক্রি করবে। হারু দত্তের সন্দেগ কথা পাকা করে ফেলেছে শুনে বাধা দেয় কুঞ্জ। তার কাছে বাধা পেয়ে প্রধান মত বদলিয়ে ফেলে। ইতিমধ্যেই চালের চোরাচালানদার হারু দত্ত এসে পড়ে ঘটনার কেন্দ্রে। কুঞ্জর সন্দেগ শুরু হল ঘাত-প্রতিঘাত। কুঞ্জকে প্রধান প্রতিবাদী হিসেবে ঘরে নিয়ে তাকে নিষ্ঠুরের মতো লাঠিপেটা করল। প্রধান বাধা দিতে গিয়েছিল, তাকেও রেহাই দিলনা। সমাদ্দার পরিবারের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে বিধবস্ত করে দিয়ে বেরিয়ে গেল দস্যু হারু দত্ত তার দল বল নিয়ে। হারু দত্তের অতর্কিত আক্রমণের অভিঘাতে বালক মাখনের মৃত্যু ঘটল। ভয়বিহ৩ল বিনোদিনীর চোখেমুখে নেমে আসল 'একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়া'।

'ন বান্ন' নাটকের মুখ্য ঘটনা এটাই। এরপরই সমাদ্দার পরিবার শহরের পথে পাড়ি দেয়। অলি-গলিতে পথে পার্কে ঘুরে ঘুরে ভিখিরির জীবনযাপন করতে থাকে। প্রধান সমাদ্দার হয়ে যায় উন্মাদপ্রায়। এরপর কাহিনী কয়েকটি ধারায় বিভশু হয়ে ক্রমশ অগ্রসর হয়েছে। একদিকে অন্দিকত হয়েছে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মর্মান্তিক জীবনযাত্রার ছবি। তুলে ধরা হয়েছে সমসাময়িক কালের সংবাদপত্রে সাংবাদিক এবং ফটোগ্রাফারদের অর্থ উপার্জনের নোংরা পথ অবলম্বনের চিত্র। তুলে ধরা হয়েছে অসহায় অভাবগ্রস্তু যুবতী মেয়েদের কেনাবেচার চিত্র। পথে পার্কে অসহায় মেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার বিবরণ রাখা হয়েছে এই নাটকে।

বিনোদিনীকে এমনিভাবে কাজের লোভ দেখিয়ে এক দালাল তুলে এনে কালীধনের কাছে বিক্রি করে দেয়। এখানে বিনোদিনী মিলিত হয় নিরঞ্জনের সন্দেগ। কালীধন অসৎ উদ্দেশ্যে মেয়ে সংগ্রহ করে অল্প পয়সার বিনিময়ে। 'সেবাশ্রম' নামক একটা জায়গায় তাদের লুকিয়ে রাখে। কালীধনের আরো একটি কারবার আছে। সে চলের মজুতদার। অল্প মূল্যে চাল কিনে গুদামজাত করে রাখে বেশি পয়সায় বিক্রি করবে বলে। তার গুদামে চাল এবং সেবাশ্রমে মেয়ে সরবরাহ করে হারু দত্ত ও টাউটের মত ঘৃণ্য মানুষজন. নাট্যকার কালীধন-হারু দত্ত নিরঞ্জন-বিনোদিনীকে নিয়ে একটি এপিসোড তৈরি করেছেন। এই অংশের পরিণতি ঘটিয়েছেন এই রকম ভাবে যে, সেবাশ্রমে আশ্রিত বিনোদিনী নিরঞ্জনের সন্দেগ আকস্মিকভাবে মিলিত হয়। সেবাশ্রমের সমস্তু গু৫ বিবরণ সে তাকে দেয়। নিরঞ্জন সমস্তু শুনে থানায় যায়। কালীধনের চালের গুদামের বিবরণ এবং সেবাশ্রমের বে-আইনী ব্যবসার কথা ফাঁস করে দিয়ে দারোগাকে ডেকে আনে। দারোগা বামালসমেত কালীধন, রাজীব ও হারু দত্তকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর নিরঞ্জন বিনোদিনী গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। পুনরায় আমিনপুরের পরিচিত মাটির কোলে ফিরে আসে, নিজেদের বাস্তুভিটেতে আবার নতুন করে ঘর তোলে।

কুঞ্জ রাধিকা প্রধান তখনও শহরের পথে ভিখিরি জীবনযাপন করতে থাকে। নাট্যকার শহরের অলিগলিতে ঘুরিয়ে শেষে তাদের নিয়ে আসে এক বড়লোকের বাড়ির সামনে। উদ্দেশ্য একটা বৈপরীত্যপূর্ণ ছবি তুলে ধরা। অর্থাৎ একদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহায় মানুষের অ-মানুষিক জীবনযাত্রার ছবি অন্দকন করা

আর তার পাশাপাশি ধনী মানুষের বিলাস-বৈভবের চিত্র, অকারণ অপচয়ের চিত্র তুলে ধরা। সেই সন্দেগ কালোবাজারী ও চোরাকারবারীদের সন্দেগ অশুভ আঁতাত দেশের শাসন ব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের চরিত্র উদঘাটন এবং এ সমস্তের পাশাপাশি ধনের সন্দেগ ধনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিযোগিতার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অপরদিকে নিরন্ন গরিব মানুষদের মধ্যে সম্পর্ক কত আন্তরিক, হৃদ্যতাপূর্ণ, প্রেমপ্রীতির বন্ধন কত নিবিড় তা দেখান হয়েছে। মানুষ যে অবস্থার ফেরে কুকুরের সন্দেগ সহাবস্থানে রত, জন্তুর জীবনযাপনে বাধ্য, কিন্তু তবুও তাদের অন্তঃকরণ মানবিক গুণসমৃদ্ধ সে দৃশ্য দেখিয়ে নাট্যকার কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছেন অন্যদিকে।

এই দৃশ্যের পর সমাদ্দার পরিবার আবার দুটি টুকরোয় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে যায় কুঞ্জ রাধিকা, আর একদিকে যায় প্রধান সমাদ্দার। কুঞ্জ রাধিকা এসে পড়ে শহরের এক লন্দগরখানায়। এখানে এসে তার সমবেত ভিখিরিদের কথা বার্তার মধ্যে আমিনপুরের ফিরে যাওয়ার প্রেরণা পায়। অতঃপর আমিনপুরের পথে পা বাড়ায়, 'কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।' অপর দিকে দল থেকে বিশ্লিষ্ট প্রধান সমাদ্দার ঘুরতে ঘুরতে এসে ওঠে একটা হাসপাতালে। তার চোখ দিয়ে নাট্যকার হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থার চরম দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। এরপরে প্রধান কোনো দুর্জ্ঞেয় প্রেরণা বশে আমিনপুরে প্রত্যাবর্তন করে নাটকের শেষাংশে।

অতঃপর নাটক চলে আসে পুনরায় আমিনপুরে। নবান্নের উৎসবে সকলে মিলিত হয়।

উপরোক্ত কাহিনী বিশ্লেষণ থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, 'নবান্ন' নাটক সরলরৈখিক ক্রিয়াকাণ্ডের নাটক নয়। জটিল ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ, সেই সন্দেগ আছে আকর্ষণীয় নাটকীয় উৎকণ্ঠা। প্রতি দৃশ্যে চমক, চমকের পর চমকে নাটকটি জমজমাটি। নাটকটির চারটি অন্দক। প্রথম অন্দেক পাঁচটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অন্দেকও পাঁচটি, তৃতীয় অন্দেক দুটি এবং চতুর্থ অন্দেক তিনটি দৃশ্য। অতএব চারটি অন্দেক মোট দৃশ্য সংখ্যা পনেরটি। প্রথম অন্দেকর পাঁচটি দৃশ্যে আমিনপুর গ্রাম। দ্বিতীয় তৃতীয় অন্দেকর সাতটি দৃশ্য শহর। চতুর্থ অন্দেকর তিনটি দৃশ্য পুনরায় আমিনপুর। সব মিলিয়ে আমিনপুর গ্রাম পেয়েছে আটটি দৃশ্য, শহর পেয়েছে সাতটি দৃশ্য। এদিক থেকে মোটামুটি ভারসাম্য বজায় থেকেছে বলা যেতে পারে। আট আর সাতে পনেরটি দৃশ্যের স্তরে স্তরে নাট্যকার সঞ্চারিত করে দিয়েছেন অপর্যাপ্ত নাট্যরস। যে রস দর্শক সাধারণকে জমিয়ে রাখবার জন্যে যথেষ্ট। শম্ভু মিত্র এই নাটকের সম্পাদনা, অভিনয় এবং পরিচালনার সন্দেগ যুক্ত ছিলেন। তিনি বলেছেন 'নবান্ন' এ ছিল একটা এপিক নাটকের ব্যাপ্তি। নাটকটির একটা এপিসোডিক কারেক্টার আছে। দৃশ্যগুলি এমনভাবে বাঁধা যে, এক একটি ক্লাইম্যাক্স, প্রতিটি দৃশ্যের শেষে আছে। সুতরাং নাটকটি যে খুব জমজমাট সে বিষয়ে কোনো সন্দ্রেহের অবকাশ নেই। তবে প্লট গঠনে শৈথিল্য খুব খানিকটা দুর্নিরীক্ষ নয়।

৪৮.৯ সারাংশ

বাংলা নাটক ও মঞ্চের ইতিহাসে 'নবান্ন' রচনা, প্রকাশ ও অভিনয় একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে।

এর পেছনে সক্রিয় ছিল একটি নতুন ভাবনা, বাংলা সহিত্য সংস্কৃতি জগতে অপেক্ষাকৃত নতুনতর রাজনৈতিক দর্শন। মানুষের কথা, মানুষের কাছে, তাদের ভাষায়, তাদের বোধের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার সন্দকল্প থেকে 'নবান্ন' নাটকের সৃষ্টি। এই নাটকে সমকাল ও ক্রান্তিকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়।

সামগ্রিক বিচারে কিছু অসন্দগতি সত্তেও 'নবান্ন' নাটককে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক হিসাবে গণ্য করা হয়। এ নাটকের মূলধারার আবর্তন ঘটেছে প্রধান সমাদ্দার-এর পরিবারকে কেন্দ্র করে। সেখানে প্রধান পুত্রদ্বয় শহীদ শ্রীপতি-ভূপতি, পত্নী পঞ্চাননী, বড় ভাইপো কুঞ্জ ও তার স্ত্রী রাধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও বিনোদিনী ও তার স্বামী নিরঞ্জন অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র। অথচ এই দুটি চরিত্রই নাটকের দুষ্টের দমন—এই সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে—চোরাচালান, মেয়ে পাচারকারী হারাধন ও মজুতদার ও নারীদেহের ব্যবসাদার কালীধনকে ধরিয়ে দিয়ে সামাজিক ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করেছে। Suffering and Struggle-এর মধ্য দিয়ে মানুষের মুশ্তির এটি যদি কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক বিধান হয় প্রধান-কুঞ্জ সেক্ষেত্রে অনেকটাই অতি সাধারণ দুর্বল চরিত্র মাত্র। যদিও এ নাটকে সমস্ত ধরনের প্রতিকূলতার তারা শিকার, তাদের জীবন যন্ত্রণাই সর্বাধিক প্রতিফলিত। কিন্তু এদের বাঁচবার আকাঙ্খাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। সম্ভবত এই শেষোশু কারণেই—শত হতাশার মধ্যেও বাঁচবার আকুলতা মানুষের জীবনে গভীরতর সত্য বলে বিষয় বস্তু অভিনয় নৈপুণ্য ও সংলাপ নাটকটিকে সেদিন জনপ্রিয় করে তুলেছিল। নবান্ন গণনাট্য হিসেবে সাফল্যের অধিকারী হয়েছে। কারণ নাটক দেশকালের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে গণচেতনার সঞ্চারে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নাটকের চতুর্দশ-পঞ্চদশ দৃশ্যে, পরিশেষে আমিনপুরের হিন্দু-মুসলমান চাষী জীবনের ক্ষয়ক্ষতি ভুলে সকলে মিলেমিশে ফসল একই খামারে তোলা, ঝাড়াই-এর পর তার একটি অংশ অনাগত ভবিষ্যৎ দুর্যোগ থেকে আত্ম রক্ষার জন্য ধর্মগোলায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা যেমন করেছে, তেমনি প্রথা অনুযায়ী মরা গন্দগার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নবান্ন উৎসবের আয়োজন করেছে।

নাটকের সামগ্রিক পর্যালোচনা শেষে স্মরণ করতে হয়, নাটকের গঠন বিন্যাস প্রসন্দগটিও। নাটক সাধারণত পঞ্চসন্ধি সমন্বিত। একটি পূর্ণান্দগ নাটক সাধারণত পাঁচটি অন্দেক বিন্যস্ত। প্রথমে নাটকীয় ঘটনার প্রস্তাবনা বা সূচনা বা এক্সপোজিশন, দ্বিতীয়ে তার ক্রমবিবর্তনের প্রথম ধাপ আরোহপর্ব বা রাইজিং অ্যাকশন, পরে নাটকের চূড়ান্ত সন্দকট মুহূর্ত ত্বcrisis) বা ক্লাইম্যাক্স-এর পর একটি পরিণতির দিকে অবরোহ, অবনমন বা ফলিং অ্যাকশন এবংনাটকের পরিণতি পর্ব বা ক্যাটাসট্রফিয় ডেনোমেন্ট—পূর্ণান্দগ বড় নাটক এই পাঁচটি স্তর অতিক্রম করে সমা৫ হয়। কিন্তু আধুনিক নাটক যুগ ও জীবনযাত্রার সন্দেগ সামঞ্জস্য বিধান করে বিষয় ও চরিত্র প্রাধান্য সূত্রে নাট্যাভিনয় ও নাটকের গঠন বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। কাহিনী নির্ভর চরিত্র নাটক, নাটকের ভরকেন্দ্র পরিবর্তন করেছে। সেক্সপীয়রীয় নাটকে চরিত্র বিকাশের জন্য যে গঠন প্রয়োজন ছিল, গিরিশ-অর্ধেন্দ্রু-দানী বাবু-অহীন্দ্র যুগে আবেগপ্রবণ চরিত্রাভিনয়ে যে দর্শককে আবেগতাড়িত করবার জন্য নাটকের বিস্তার প্রয়োজন ছিল, পরবর্তীকালে যুগযন্ত্রণাকে প্রকাশের জন্য দ্বন্দ্বতসন্দকুল মূহূর্ত ফুটিয়ে তুলতে

সেই পরিসরের প্রয়োজন নেই, তাই পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত আবেগসর্বস্ব চরিত্রাভিনয়ে ভাটা পড়ায় আধুনিক নাটক ক্রমশ তিন অঙ্কক থেকে একাঙ্কে রূপান্তরিত হয়েছে। এ যুগের প্রধান চরিত্রগুলি ক্রমশ হয়ে উঠেছিল মনস্তত্ত্ব নির্ভর এবং সমস্ত নাটকে ঘটছিল মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য। ঠিক এরই পাশাপাশি আরও একটি ধারা যুক্ত হল চারের দশকে, গণনাট্যের সূচনাপর্ব থেকে। এ নাটকে ব্যক্তি নয়, ব্যষ্টি বা সমষ্টির প্রাধান্য। আর এই সমষ্টি ভাবনার জন্যই গণচেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে নাটক ব্যবহার করা হয়। গণনাটকে তাই ব্যক্তি ও সমষ্টির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজ মনস্তত্ত্বের যোগ দেখা যায়। গণনাটকে শোষকদের সঙ্গে শোষিতের সংঘাত হয়ে ওঠে অনিবার্য। এই সংঘাত থেকেই নাটকীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। নবান্নে বহু মানুষের সমর্থনে দাঁড়িয়ে নাট্যকার শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের, সংগ্রামের ছবি তুলে ধরেছেন।

উচ্চকণ্ঠ হয়ে এই বক্তব্য দীর্ঘ সময় জুড়ে বলা যায়না। তাই নাট্যকার পাঁচটি অঙ্কের পরিবর্তে চার অঙ্কে মোট পনের দৃশ্যে তাঁর বক্তব্য পরিবেশন করেছেন। অকুস্থল মেদিনীপুর, আমিনপুর একটি কল্পিত গ্রাম হলেও, সমকালীন বহু বিচিত্র ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ নাটক রচিত। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, মেদিনীপুরের সংগ্রামী ইতিহাস, মন্বন্তর-মহামারী, মড়ক—এরই মধ্যে কিছু মানুষের বাঁচার সংগ্রাম। দুঃখ, দুর্যোগের অবসানে, সকলে মিলে সব দুঃখ সয়েও, অনাগত ভবিষ্যতের সঙ্কট উত্তরণের জন্য ধর্মগোলার সঙ্কল্প নিয়ে।

দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নাটকের মূল বিষয় বস্তুকে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করেছেন। নাটকের চরম মুহূর্ত বা ক্লাইম্যাক্স বলে যদি কোনো কিছু কল্পনা করা হয় তবে দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যটিকে ধরা যেতে পারে। দ্বিতীয় অঙ্কে গ্রামসমাজের অত্যাচার অনাচারের নায়কদের শাস্তির উপযুক্ত ব্যবস্থার পর তৃতীয় অঙ্কের সামান্য দুটি দৃশ্যে লঙ্গরখানা ও চিকিৎসাকেন্দ্রের অব্যবস্থার পরিচয় দিয়ে দ্রুত নাটকের উপসংহার টানা হয়েছে চতুর্থ অঙ্কে। নবান্নের কাহিনী বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায়, এনাটক সরলরৈখিক ক্রিয়াকাণ্ডের নাটক নয়। এটি জটিল ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ। এর প্রায় প্রতিদৃশ্যে আছে চমক। পনের দৃশ্যের মধ্যে আটটি দৃশ্যে আমিনপুরে, আর সাতটি শহরে সংঘটিত। গ্রাম-শহরের দৃশ্য সমাবেশ করে নাট্যকার ভারসাম্য রক্ষা করে স্তরে স্তরে নাট্যরস সঞ্চারিত করেছেন। প্রথম পর্বের অন্যতম নাটক পরিচালক ও অভিনেতা শম্ভু মিত্র। নবান্ন নাটকের মহাকাব্যিক 'এপিক' ও 'এপিসোডিক ক্যারেকটার' পরিচয় লক্ষ্য করেছেন। ফলত নাটকটি যে অভিনয়ে খুবই জমে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৪৮.১০ অনুশীলনী ২

১। নিচের সংলাপগুলি পড়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিন :

ক. প্রধান। চলো চলে যাই।

দয়াল। কোথায়?

প্রধান। কোন শহরে? অন্নকুট খুলেছে সেখানে সব বাবুরা।

— বক্তা কেন পরিস্থিতিতে, কেন এবং কোথায় যাওয়ার কথা বলেছেন? 'অন্নকূট' শব্দটির বাচ্যার্থ ও ব্যঞ্জনার্থ বুঝিয়ে দিন।

জ্ঞান "চাল খায়। বড় চাল খাউন্যাঙ্গ চাল খাইতে আইছেঙ্গ দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় যত সব।"

— বক্তা কে? কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে? মন্তব্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

জ্ঞান "আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—" — বক্তা কে? কুঞ্জকে একথা বলার কারণ কী?

জ্ঞান "আমিনপুরের কলন্দক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস।"— বক্তা কে? কাদের বলেছেন? আমিনপুরের কলন্দক বলবার কারণ কী? বক্তার চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। "নবান্ন' নাটকের গঠনগত বিশিষ্টতার পরিচয় দিন।

৩। 'নবান্ন একই সঙ্গে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক।'—মন্তব্যটির সারবত্তা বিশ্লেষণ করুন।

৪। বিষয়বস্তু, উপস্থাপক ও চরিত্র পরিকল্পনায় 'নবান্ন' অভিনবত্ব দাবি করতে পারে।— মন্তব্যটি কতদূর যথার্থ আলোচনা করুন।

৫। 'নবান্ন' সমকালীন সমাজ ও নাট্য আন্দোলনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করলেও, শিল্পসৃষ্টি হিসেবে দুর্বল। — এ সম্পর্কে আপনার অভিমত যুক্তি সহ প্রতিষ্ঠিত করুন।

৪৮.১১ 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র আলোচনা

একটি নাটকের জন্য কাহিনী, সংলাপের সঙ্গে চরিত্রের বিশেষ প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যাবে না। নাটকে চরিত্র একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বর্তমানে নাটকে চরিত্র সংখ্যা খুবই সীমিত। একটি বা দুটি চরিত্র দিয়ে একটি নাটকের সাবলীল গঠনকার্য সমাধা হতে পারে।

বাংলা অপেশাদার গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম মঞ্চসফল নাটক 'নবান্ন' কিন্তু এদিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'নবান্ন' নাটকে ছোট বড় চরিত্র মিলে প্রায় পঁয়তাল্লিশটা চরিত্র। আমরা এখানে 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অভিনয়ের চরিত্রলিপিটা তুলে দিলাম ছ

প্রধান সমাদ্দার	আমিনপুরের বৃদ্ধচাষী	বিজন ভট্টাচার্য
কুঞ্জ সমাদ্দার	প্রধানের ভাইপো	সুধী প্রধান
নিরঞ্জন সমাদ্দার	কুঞ্জের সহোদর	জলধর চট্টোপাধ্যায়
মাখন	কুঞ্জর ছেলে	মণিকা ভট্টাচার্য জ্বচক্র বর্তীৰ
দয়াল মণ্ডল	প্রতিবেশী	শম্ভু মিত্র

হারু দত্ত	স্থানীয় পোদ্দার	গঙ্গাপদ বসু
কালীধন ধাড়া	চাল ব্যবসায়ী	চারুপ্রকাশ ঘোষ
রাজীব	কালীধনের সরকার	সজল রায়চৌধুরী
চন্দ্রর	জনৈক চাষী	রঞ্জিত বসু
যুধিষ্ঠির	আন্দোলনকারী	নীহার দাশগুপ্ত
ফটোগ্রাফারদ্বয়	সংবাদপত্রের প্রতিনিধি	অমল ভট্টাঃ, রবীন মজুমদার
প্রথম ভদ্রলোক	চাল খরিদ্দার	মনোরঞ্জন বড়াল
বরকর্তা	বড়কর্তা	চিত্ত হোড়
বৃদ্ধ ভিখারি	—	গোপাল হালদার
ডোম	—	শম্ভু হালদার
দারোগা	—	বিমলেন্দু ঘোষ
ডাক্তার	—	সমর রায়চৌধুরী
দিগম্বর	—	অজিত মিত্র
ফকির	—	সত্যজীবন ভট্টাচার্য
পঞ্চাননী	প্রধানের স্ত্রী	মণিকুন্তলা সেন
রাধিকা	কুঞ্জর স্ত্রী	শোভা সেন
বিনোদিনী	নিরঞ্জনের স্ত্রী	তৃপ্তি ভাদুড়ী (মিত্র)
খুকির মা	হারু দত্তের মা	
ভিখারিণী	—	বিভা সেন
বাংলার ম্যাডোনা	—	ললিতা বিশ্বাস

ভদ্রলোক, নির্মল বাবু, টাউট, ভিখারী, হারু দত্তের শালা, কনেস্টবল, রোগী, ভৃত্য, চন্দ্ররের মেয়ে, বরকত, কৃষক, নিরন্নের দল, জনতা ইত্যাদি।

চরিত্রলিপি থেকে বোঝা যাচ্ছে 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র সংখ্যা অনেক। এতো চরিত্র সংখ্যার পিছনের কারণটা অবশ্য এই নাটকের বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা। বিষয় বৈচিত্র্য, সময়দীর্ঘতা এবং প্রেক্ষাপটের বিস্তীর্ণতা প্রভৃতি হেতু নবান্ন নাটকের চরিত্রলিপিও বিরাট হয়ে গেছে। একই সঙ্গে আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, এবং বিশ্বযুদ্ধের পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হয়েছে নাটকে। গ্রাম ও শহরের চিত্র, সমাজ ব্যবস্থার চরম দুরবস্থা, নৈতিক অধঃপতন, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি তুলে ধরে একটা প্রতিরোধমূলক মুহূর্ত সৃষ্টি করতে গেলে যেমন নাটককে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বিছিয়ে দিতে হয়, সেই রকম সর্বস্তরের সুচারু নাট্য রূপায়ণ করতে গেলে চরিত্র সংখ্যা বৃদ্ধির অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করা যাবে না। বর্তমানে, নাটকে জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট

ও ব্যপকত্বের পরিবর্তে ছোট ছোট ছবি তুলে ধরবার প্রয়াসটা লক্ষিত হয় বেশি।

'নবান্ন' নাটকে বড় চরিত্রগুলো ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে দেওয়া গেল। প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ সমাদ্দার, নিরঞ্জন সমাদ্দার, দয়াল মণ্ডল, হারু দত্ত, কালীধন ধাড়া, রাজীব। স্ত্রী চরিত্রগুলি যথাক্রমে রাধিকা, বিনোদিনী, পঞ্চাননী। একটিমাত্র শিশু চরিত্র মাখন। নাটকে এদেরই ভূমিকাংশ বেশি। এরাই নাটকের প্রধান চালিকাশক্তি। এদেরই অভিনয় নৈপুণ্যের দৌলতে নাটক দ্রুত গতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। আলোচ্য প্রতিটি চরিত্রের অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্র নাটকে সুবিস্তৃত। প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ ও নিরঞ্জন সমাদ্দার, রাধিকা, বিনোদিনী, পঞ্চাননী এবং মাখন এক পরিবারভুক্ত। দয়াল প্রতিবেশী, হারু দত্ত, কালীধন চোরাকারবারী ও চোরাচালানদার। রাজীব কালীধনের সরকার। মূলত এই চরিত্রগুলোকে বিকশিত করবার জন্য, প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য, পরিণতি প্রদর্শনের জন্য নাটকের অপরাপর চরিত্রগুলো রূপায়িত হয়েছে।

নাটকে সাধারণত তিন ধাঁচের চরিত্র দেখা যায়। ফ্লাট চরিত্র, রাউণ্ড চরিত্র, টাইপ চরিত্র। ফ্লাট চরিত্র বড় কিন্তু আগাগোড়া একঢালা। একই রকমভাবে চলতে থাকে। অন্তর জগতের উত্থান-পতন, ভাঙাগড়া, দ্বন্দ্ব-সংঘাত—ইত্যাদির গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত আকুলতা ব্যাকুলতার টানাপোড়েনের রেখচিত্র অন্দ্বিকত না করে সরলরৈখিক ভাবে চলতে থাকে। এ ধরনের চরিত্র প্রধান সমাদ্দার। রাউণ্ড দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। অর্ন্তদ্বন্দ্বে এবং বহির্দ্বন্দ্বে বিশেষভাবে আন্দ্বোলিত। নাটকে সাধারণত নায়ক চরিত্র এই শ্রেণীতে পড়ে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয় এই ধরনের চরিত্র। নবান্ন নাটকে কুঞ্জ এই রাউণ্ড চরিত্রের মধ্যে পড়ে।

প্রধান সমাদ্দার নাটকের প্রথম দৃশ্যেই দর্শকের সামনে যখন উপস্থিত হয় তখনই তার বার্ধক্য অবস্থা। কিন্তু সেই বয়সেই তার ভেতরে একটা আগ্নিস্ফুলিন্দ্বগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তার দুটি পুত্র ছিল, শ্রীপতি ভূপতি। বৃদ্ধা স্ত্রী পঞ্চাননীর পুত্র এই দুটি মৃত। মৃত পুত্রের শোক বুকে নিয়ে প্রধান সমাদ্দার হত্যা ও সন্ত্রাসবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সে দুর্দান্ত আবেগে ভরপুর। এরই মাঝে সে অন্দ্বকন করেছে অনাগত দিনের রঙিন চিত্র। কিন্তু সব মিলিয়ে কেমন যেন এক উদ্‌ভ্রান্তি তার সর্বান্দ্বেগ জড়িয়ে। ভ্রাতুষ্পুত্র কুঞ্জর চোখে সেটা এড়িয়ে যায়নি। অসংলগ্ন কথা বার্তা, অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কের অসংযত পরিকল্পনা কখনো কখনো প্রাণ দেওয়ার পাগলামো ব্যাকুল কথা বার্তায় কুঞ্জ ঠিকই ধরেছে 'শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে গেল দুটো ছেলের শোকে।' পুত্রদুটিকে হারিয়ে বৃদ্ধ প্রধান সমাদ্দার পঞ্চাননীকে সম্বল করে বাকি জীবনটা কাটাতে পারত, কিন্তু সর্বব্যাপক আন্দ্বোলন ও তাকে দমন করবার জন্য সর্বনাশা অত্যাচার ও নির্যাতনে প্রতিরোধ বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তার মৃত্যু হওয়াতে সে সম্বলটুকু চলে গেল। সর্বনাশা ঘাত-প্রতিঘাত কেড়ে নিল দুই পুত্র। তিন মরাই ধান নষ্ট হয়ে গেল। পঞ্চাননী প্রাণ দিল। এরই মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্রের সংসার এবং নাতি মাখনকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল যেটুকু জমি জায়গা আছে তার ওপর ভর করে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর এবং সর্বনাশা বন্যা এসে স্বপ্নের শেষাংশটুকু কেড়ে নিয়ে গেল। তারপর এলো চোরাচালানদার হারু দত্তের আক্রমণ। অপদস্থ হল গ্রামের মাতব্বর গোছের প্রধান সমাদ্দার। এরই ভেতর ঘটল মাখনের মৃত্যু। ছাড়তে হল গ্রাম।

শহরের পার্ক ও ফুটপাতকে আশ্রয় করে ভিক্ষা বৃত্তিগ্রহণ করতে বাধ্য হতে হল তাকে। একের পর এক এ বম্বিধ দুর্ঘটনায় প্রধান সমাদ্দার মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল।

গ্রামের এই সরল সাদাসিধে মানুষটি যার অভ্যন্তরে এক প্রতিরোধপরায়ণ প্রতিস্পর্ধী সাহসিকতার অপর্যা৫ সঞ্চয় ছিল,যা তার মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে উত্ত৫ লাভা স্রোতের মতো বেরিয়ে এসেছে, 'চল্‌তো গাও বরাবর এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের, ডাকসব ওদের কুঞ্জ।' কিন্তু তারপর থেকে চরিত্রটা কেমন এক অহেতুক অসহায়তার কবলে আত্মসমর্পণ করে শণ্ডি শালী ব্যণ্ডি ত্ব প্রকাশের পরি বর্তে অসংযত পাগলামোর খাপছাড়া বিগ্রহে পরিণত হল। এ বশু ব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে প্রথম অন্দ্বেকর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম দৃশ্যে। হারু দত্তের লোকজন যখন কুঞ্জকে লাঠিপেটা করছে তখন প্রধানের বুকের ভেতর স্তুপীকৃত বারুদের বিস্ফোরণ ঘটবার পরি বর্তে আত্ম রক্ষার অসহায়তা ফুটে উঠেছে, 'মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।' প্রথম দৃশ্যের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় দর্পিত বীরত্বের একটুখানিও যদি দেখা যেত তাহলেও চরিত্রটা সন্দ্বগতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারতো। আর তার পরের পরি বর্তনটাকে আমরা এইভাবে মেনে নিতে পারতাম যে বিপর্যয়ের আতিশয্য বশত চরিত্রটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু প্রথম অন্দ্বেকর বিভিন্ন দৃশ্যে তার চরিত্রে কখনো কখনো দেখা গেছে তীব্র সচেতনতা, 'কী কী বললি তুই কুঞ্জঙ্গ ছলনাঙ্গ নাকী কান্নাঙ্গ আমার সহানুভুতি মিথ্যে তোর কাছে? অপমান করলি তুই আমারেঙ্গ আমারে অপমান করলি তুইঙ্গ তুই আমারে অপমান করলি —'[১ম অন্দ্বক, চতুর্থ দৃশ্য] কিংবা, 'ছোট ভুলের ক্ষমা আছে, বুঝলে দয়ালঙ্গ কিন্তু বড়ে ভুলের আর চারা নেই। করতেই হবে তোমাকে প্রায়ছিত্ত।' অথবা, 'ভদ্দরনোকের নামে মুখ করছ, কিন্তু এই ভদ্দরনোক ছাড়া আবার গতিও নেই আমাদের এখন। শত হোক, সেই ঘুরে ফিরে যেতেই হবে তোমার ভদ্দরনোকের দোরে। উপায় নেই।'[১ম অন্দ্বক, তৃতীয় দৃশ্য] সংলাপগুলো চরিত্রটার সচেতনতার দিকটি তুলে ধরে, গভীরতর উপলব্ধির তলদেশ থেকে উঠে এসেছে বলে বোধ হতে পারে, কিন্তু তাৎক্ষণিক। পরের পর্বেই দেখা গেছে চরিত্রটি গতিপথ পরি বর্তন করেছে। আর গ্রাম থেকে শহরে এসে পড়বার পর চরিত্রটি হয়ে পড়েছে অতিরিশু নিষ্ক্রিয়। পাগলামির ভাব বজায় আছে বটে এবং কখনো কখনো পাগলামো অবস্টথায় কিছু কিছু প্রতীকধর্মী সংলাপ উ২চারণ করে দর্শক মনে দাগ টানবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ঠিক, কিন্তু মনের জগতে যে তীব্র দ্বচ্ছ্রত-সংঘাতের প্রতি২ছবি সরীসৃপের মতো এঁকেবেঁকে উঠে এসে বাহ্যিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটা তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে চরিত্রটি যাতে রাউণ্ড হয়ে ওঠে, তার এমন কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ফলে চরিত্রটি এক ঢালা হয়ে অসংযত চিন্তা ভাবনার খাপছাড়া বিগ্রহে পরিণত হয়েছে। কোনো ভাবেই কখনোই গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। অথচ চরিত্রটার প্রতি যত্নের কোনো ত্রুটি ছিলনা। কিন্তু এই যত্ন সম্ভবত একটিমাত্র কলমের নয়। নাটকটি লিখিত হওয়ার পর, মনে হয়, সম্পাদনার সময় বহুজনের সযত্ন হস্তক্ষেপের ফলে এমনটি ঘটেছে, যা নাটকের মধ্যে খুব খানিকটা দুর্নিরীক্ষ নয়। বহু যত্নে সন্তানের যে অবস্টথা হয় প্রধান সমাদ্দারের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। তাই চরিত্রটি ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি, টুকরো টুকরো মনে সযত্ন প্রয়াসের ফল হিসাবে

সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গভীর হয়ে উঠতে পারেনি। ঠিক যেন শান্ত নদীর বুকে মৃদুমন্দ্র বাতাসের আন্দোলনে অল্প অল্প তরঙ্গের উত্থান-পতনের মতো হয়ে চরিত্রটা অতর্কিত ভাবে পরিণতির পর্বে এসে পৌঁছেছে। প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝায় সমুদ্র গর্ভে যে ভয়াল ভয়ঙ্কর উত্তালতা সৃষ্টি করে মনের ওপর গভীর ও গাঢ় দাস টানে তেমন ভাবে চরিত্রটা গড়ে ওঠেনি। অথচ নাটকের বিষয়টা ছিল ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভের ঘনঘটায় পরিপূর্ণ।

অপরপক্ষে, কুঞ্জ চরিত্রটা কিঞ্চিৎ পরিমাণে জীবনের উত্তপ্ত আবর্তের ওপর দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে। তার সংবহনতন্ত্রী তারুণ্যের তাজা রক্ত সুষম বন্টনের ফলে মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যথাযথ ভারসাম্য বজায় থেকেছে। সে বুঝতে পারছে মারমুখী সন্ত্রাস বাজদের সামনে এগিয়ে যাওয়া মানে হঠকারিতা, তাই অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে প্রধানের প্রৌঢ় মনের দপ করে উদী৫ হয়ে ওঠাকে দমন করেছে, 'তা খামখা জান দিয়ে কি কোনো লাভ আছে? চলো, চলো ঐ বনের ভেতরই পালাই।'[১ম অন্দক, প্রথম দৃশ্য] যদিও প্রধান এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছে, 'আমি তাই বলি কুঞ্জ এগিয়ে চল, এগিয়ে চল্, বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের চতা কুঞ্জ শোনো না, কুঞ্জ শুধু পালায়, কুঞ্জ শুধু—'[১ম অন্দক, প্রথম দৃশ্য] এই বশু ব্য কুঞ্জর পলায়ন বাদিতার দৃষ্টান্ত হতে পারে, কিন্তু কুঞ্জ সম্পর্কে এই কথাই যথেষ্ট নয়। হারু দত্ত প্রধানকে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করার সময় কুঞ্জ তীব্র প্রতিবাদ বাক্য উ২চারণ করে তার বীরত্বের প্রমাণ রেখেছে,.....'জমি যার সে বলছে বিক্রি কর ব নাচ আর উনি শুধু বলছেন কথার খেলাপ করেছে। ভারি আমার কথা রাখনেওয়ালা রে।' প্রধান চুপ করতে বলায় সে দপ করে্ জ্বলে উঠেছে, 'কেন, কিসের জন্য। গলা দিয়ে এইবার এট্টা রা কাড়ো বুঝলে, চেঁচাও,—অন্তত আর পাঁচজন মানুষ জানুক।' হারু দত্ত ছোটলোক বলে গালাগালি দেওয়ায় কুঞ্জ মাথা ঠিক রেখে প্রতিবাদ জানিয়েছে, 'এই গালাগালি দিয়ো না বলছি, ভালো হবে না।' 'এই মুখ সামলে কথা বলো কিন্তুক।' কিন্তু হারু দত্ত যখন উত্তেজিত ভাবে প্রধানকে খ২চর বলে গাল দিয়েছে, তখন কুঞ্জ নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি, দপ্ করে্ জ্বলে উঠেছে সে, 'হেত্তেরি শালা নিকুচি করেছে তোর ঝামেলার—' বেগে প্রস্থান করে লাঠি হাতে প্রবেশ করেছে সে। হারু দত্তের লোকজনের সন্দেগ লড়াই করেছে সে জমি এবং মান ই৭ ৎ রাখতে। কুঞ্জ চরিত্রের এটাই প্রথম মাত্রা। কুঞ্জ ভীরু নয়, পলায়নী মনোভাবকে আশ্রয় করেনি, সাহসিকতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কুঞ্জ দুর্দান্ত শক্তি সম্পন্ন।

কুঞ্জ চরিত্রের দ্বিতীয় মাত্রা, কোনো ওপরওয়ালা নয়, ভাগ্য কিংবা ভগবান নয়, আত্মশক্তি র ওপর নির্ভরশীলতা। কুঞ্জ কৃষক জীবন মন্থন করে যে সত্য তুলে এনেছে, তা হল—'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছেচ ওতে আর ভয় করি নে।' [১ম অন্দক পঞ্চম দৃশ্য] কুঞ্জ এই সত্যের শীর্ষবিন্দুতে একদিনেই আরোহণ করেনি। অতি বাস্তব ঘটনার সন্দেগ যুক্ত থেকে অর্জন করেছে এই অভিজ্ঞতা। সে দেখেছে, মনুষ্যসৃষ্ট সন্ত্রাস মানুষের প্রাণ নিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে মানুষের ঘরবাড়ি। অতি বাস্তব বন্যা গরিব মানুষের আশ্রয় এবং অন্ন কেড়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে ঠেলে দিয়েছে মানুষকে। অপরপক্ষে যারা নিরন্ন মানুষের মুখের খাবার আর অসহায় নারীর মান ই৭ তের মূল্য না দিয়ে বেচাকেনার খোলা বাজার বসিয়েছে ঈশ্বর কেবলমাত্র তাদের প্রতি সদয় এটা একটা লোকঠকানো ধুর্তুমি।

তাই অত্যাচারী যখন সেই কথা স্মরণ করিয়ে শোষণকে অব্যাহত রাখতে চায় তখন দৃঢ় প্রতিবাদের অগ্নি দপ করে জ্বলে ওঠে তার চোখে মুখে। বলে, 'তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছেচ ওতে আর ভয় করি নে।' [১ম অন্ধক, পঞ্চম দৃশ্য] সুতরাং ওপরওয়ালা, ভাগ্য বা ভগবান নয়, মানুষের অত্যাচারী ভূমিকা এবং সেই মানুষের ভেতরই রয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধেদাঁড়াবার অগ্নিস্ফুলিন্দগ। অযুত সম্ভাবনা, নিযুত সাহসিকতা।

কুঞ্জ গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার এক জীবন্ত প্রতিনিধি। প্রধানের পর সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান সে। সেই সুবাদে সে এই পরিবারের যুবরাজ। স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভ্রাতৃবধূ ও জ্যেষ্ঠতাত—এই নিয়ে তার চাষাড়ে সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের মূলধন জমি, কিন্তু অভাবের এক২ছত্র আধিপত্যের কাছে সামান্য জমি এতগুলো মানুষের জীবনযাত্রাকে সরলরৈখিক পথে টেনে নিয়ে যেতে পারেনা। তাই অনিবার্যভাবে তার ঘর গৃহস্থালীতে এসে পড়ে ছোটখাট ঝগড়া-বিবাদ। রচিত হয় মতানৈক্যের রোজনামচা। 'সোজা কথায় বললেই হয় যে, না, ফুরিয়ে গেছে সেই ধান। তা না মেয়েমানুষের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে আমার পায়ের তলা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত একেবারে রি রি করে জ্বলে ওঠে।' [১ম অন্ধক, দ্বিতীয় দৃশ্য] নিজের স্ত্রীর প্রতি এধরনের মন্তব্য করতে এই চাষাড়ে যুবরাজের এতটুকু দ্বিধা হয় না বটে কিন্তু ভাই নিরঞ্জনের গঞ্জনায় যখন ভ্রাতৃবধূ বিনোদিনীর চোখে জল ঝরতে দেখে তখন মাথা ঠিক রাখতে পারে না, ফের মেরেছিস বুঝি?..... বলি ফের আবার তুই গায়ে হাত তুলিছিস পরের মেয়ের? পশু বলে গালা গাল দিয়ে একখানা কাঠ দিয়ে মাথায় আঘাত করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মেয়ে মানুষের গায়ে হাত.....বেরো বেরো তুই, বেরো।' কিন্তু তারপর ভাই-এর রশু দেখে সম্বিত ফিরে পেয়ে আত্মগ্লানিতে ভরে যায় তার মন।'খুন করে ফেললামঙ্গ খুন করে ফেললাম আমি নিরঞ্জনরেঙ্গ নিরঞ্জনঙ্গ নিরঞ্জনঙ্গঙ্গ' জ্ব১য়২ৰ কুঞ্জর যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের হাহাকারটা নাট্যমঞ্চ প্রবল প্রতিক্রিয়া সন্দেগ দর্শন করলে আমাদের মনে মর্মস্পর্শী আবেদন সৃষ্টি না করে পারেনা। সুতরাং গৃহকর্তা হিসাবে অভাবের আতিশয্যে যেমন সে নিজের সহধর্মিণীর সন্দেগ অন্যায় ঝগড়া বিবাদে মত্ত হয়, তেমনই পরিবারের অন্যদের দয়ামায়া স্নেহমমতার গাঢ় আলিন্দগনে বেঁধে রাখতে চায়। এই যে প্রীতিপূর্ণ বন্ধনস্পৃহা—এটি কুঞ্জ চরিত্রের তৃতীয় মাত্রা।

কুঞ্জ শুধু নিজের সংসারটাকে ঝড়ঝাপটার মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার দায়ে আবদ্ধনয়। প্রতিবেশী সম্পর্কেও তার অন্তরে একটা দুর্বল জায়গা আছে। কুঞ্জ বাইরে কঠিন, বাহ্যিক আচরণও খুব খানিকটা রুঢ়। কিন্তু রুঢ় কাঠিন্যের অভ্যন্তরে একটা নরম তুলতুলে জায়গা আছে, যেখানটা ঠিকমতো ঘা লাগাতে পারলে দরদর করে নিঃসৃত হবে অজস্র দয়ার নির্যাস। নিজের অভুশু পরিবারের জন্যে ঘটিবাটি বিক্রি করে যে ক'মুঠো চাল কিনে এনেছে তার দাবিদার পরিবারস্থ পাঁচজন ব্যক্তি । প্রধান সমাদ্দার সে কথা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেও ফেলে, 'শেষ সম্বল দু'খানা পেতলের কাঁসি আর ঘটিবাটি বেচে সের দুয়েক চাল নিয়ে এয়েছে কুঞ্জচ পাঁচজনের সংসার, বলো তো কার মুখে দিই এই চাল ক'টা?' জ্ব১য়৩ৰকুঞ্জও কতকটা প্রধানের কথার প্রতিধ্বনি করে, 'রাঙার মা ধুঁকছে কাল বিকেলবেলা থেকে, অমুকের মা ধুঁকছে কাল দুপুরবেলা থেকে, তমুকের মা ধুঁকছে আজ সকালবেলা থেকে, এই তো এখন শুনতে হবে। জ্ব১য়৩ৰ মুখে উ২চারণ করলেও কুঞ্জর অন্তরের

কথা তা নয়। তাই দয়ালের একমুঠো চালের আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারেনা সে। শেষ সম্বলের থেকে কিছুটা চাল দয়ালকে দিয়ে নিজে খুব খানিকটা তৃপ্তি পায়। এই প্রতিবেশী প্রীতি কুঞ্জ চরিত্রের চতুর্থ মাত্রা।

কুঞ্জ গ্রাম্য এক কৃষক সন্তান। রাগ দ্বেষ বিবাদ বিসম্বাদের পাশাপাশি পরিবার এবং প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতি এই কৃষক সন্তানের সব কথা নয়। সময়ের ঘূর্ণাবর্তে বিঘূর্ণিত হতে হতে সময়ের গতিপ্রকৃতি কোন আবর্ত রচনা করতে পারে সে সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। গ্রাম্য জীবনে যে অনতিবিলম্বে নেমে আসবে এক হাহাকার তা তার দূরদর্শিতায় ধরা পড়ে। তাই সে অন্য সকলের মতো বিচলিত না হয়ে খুব সহজেই উচ্চারণ করে, 'বলা-কওয়ার তো আর এখন কিছু নেই। আর পাঁচজনের যে অবস্থা হয়েছে, আমাদেরও সেই অবস্থা হবে। দশজনের মতো আমাদেরও ঐ রাস্তায় নেমে দাঁড়াতে হবে।'জ্ঝ১য়৩ৰ

কুঞ্জের এই ভবিষ্যদ্বাণী কোন অদৃষ্টদ্রষ্টা সাধুসন্তর ভবিষ্যদ্বাণী নয়, ঘটনার স্রোতে ভাসন্ত এক বাস্তববাদী মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। এই সত্য যে কতখানি নির্মম, নিষ্ঠুর তার পরিচয় দ্বিতীয় অন্দ্বেক পাওয়া যায়। অসংখ্য মানুষের সন্দ্বেগ তারা গ্রামের মাটির কোল থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে শহরের পার্কে, ফুটপাতে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভিখারী জীবনে সন্দ্বেগ হাত মেলাতে বাধ্য হয়। জ্ঝদ্রষ্টব্য ২য় অন্দ্বক, ২য় দৃশ্যৰ এক গ্রাম্য অশিক্ষিত কৃষক সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সময়ের গতি প্রকৃতি জীবনের ওপর যে অনিবার্য বিপর্যয় টেনে আনতে পারে সে সম্পর্কে দূরদর্শিতার ক্ষমতা কুঞ্জ চরিত্রের পঞ্চম মাত্রা।

গ্রাম্য পটভূমিকায় কুঞ্জের ছোটখাটো একটা মর্যাদার আসন ছিল। পাড়াপড়শীরা সে আসনটা কেড়ে নেয়নি। কুঞ্জও সে আসনের যথাযোগ্য মূল্য দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আবার নিজের পরিবারস্থ সভ্যগণের প্রতি তার আন্তরিক স্নেহমমতা ভালবাসার ঘাটতি ছিল না। একের পর এক বিপর্যয় প্রধানকে উন্মাদগ্রস্ত করে তুলেছে, সংসারে জ্যেষ্ঠ সভ্য হওয়া সত্ত্বেও মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে যথাযোগ্য কর্তব্যকর্মে অনেকক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে, দুটি পুত্রকে হারিয়ে শোকের পৌনঃপুনিক বিলাপের শোককে গভীর হতে দেয়নি। কিন্তু কুঞ্জ একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে সংযত বিলাপে শোককে গভীরে নিয়ে গেছে। মতিভ্রান্ত হয়ে পুরো পরিবার— যারা তাকে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে, তাদের প্রতি উদাসীন হয়ে ওঠেনি। কেন না, পুত্রশোকটা তার কাছে তত বড় হয়ে ওঠেনি, যত বড় করে দেখেছে সে গোটা কৃষক সমাজের বিপর্যয়কে।

কিন্তু তবুও সকলকে ধরে রাখতে পারেনি সে। প্রথম হারিয়েছে নিরঞ্জনকে। সে দেশান্তরী হয়েছে, দারিদ্র ও ক্ষুধার তাড়নায় ঝালা-পালা হয়ে। পরে পুত্র মাখনকে অতর্কিত মৃত্যু এসে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে গেছে। তারপর প্রাণের প্রিয় আমিনপুর, তারপর ভ্রাতৃবধু বিনোদিনী। কিন্তু তবুও অবিচলিতভাবে ভিখারী জীবনের হাত ধরে নিদারুণ দুঃসময়ের আঘাতকে সহ্য করবার শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে সে। বৃদ্ধপ্রধানকে সন্দ্বেগ নিয়ে কুকুরের সন্দ্বেগ সহাবস্থান করেছে। কুকুরের সন্দ্বেগ লড়াই করে টুকরো খানেক খাবার অন্বেষণ করেছে ডাস্টবিনের মলয়া ঘেঁটে। পশুর সন্দ্বেগ প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে পশুর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। জ্ঝদ্রষ্টব্য ছ২য় অন্দ্বক, ৩য় দৃশ্যৰ কিন্তু তবু জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগেনি। দুর্দান্ত জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত হয়নি। অবসাদগ্রস্ত হয়ে পিছু হটেনি। বরং জীবনকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে গভীর মমতায়। স্ত্রীর প্রতি

তা র সেই মমতা অজস্রধা রে ঝড়ে পড়েছে। গভী র প্রেমে, 'কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকা র দিকেচ তা রপ র বাঁ হাতখানা তুলে দেয় রাধিকা র মাথা র ওপ র।' ফুটপাতে র ওপ র তৈরি ক রে ফেলে বড় প্রেমে র এক বি রল অথচ সক রুণ মুহূর্ত।

এই স্নেহমমতা প্রেমপ্রীতি আ র ভাল বাসা কুঞ্জ চ রিত্রে র স বচেয়ে বড় সম্বল। ঝড়-ঝঞ্ঝা দৈ ব-দুর্বিপাকেও সে বিনষ্ট হতে দেয়নি এগুলিকে। রশু াশু হয়েছে। ক্ষতবিক্ষত হয়েছেচ লাঞ্ছনা, অ বমাননা আ র নিপীড়নে জর্জ রিত হয়েছে, কিন্তু ভেঙে পড়েনি, দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে যায়নি। আজন্ম কালে র বাস্তুভিটা আমিনপু রে র স্মৃতি একটুও মলিন হয়ে যায়নি। স্মৃতি র টানে তাই সে আমিনপু রে ফি রে যাওয়া র জন্য ব্যাকুলতা বোধ ক রে, 'হেঃ, কী যে আনন্দ্র হয় বউ আমা র, সে আমি তো রে—চল্ বউ আম রা গাঁয়ে ফি রে যাই। এ পোড়া মাটি র দেশে আ র থাক ব না।' জ্বত্য়১ৰ আমিনপু র-প্রীতিই তা র প্রত্যা বর্তনে র পথ প্রশস্ত ক রে।

স র্বশেষে বলা যায় কুঞ্জ চ রম আশা বাদী। বড় বড় দুর্ঘটনা তাকে নৈ রাশ্যে র পন্দ্বককুণ্ডে নিমণি ত ক রেনি। স ব হা রিয়েছে বটে তবে হা হুতাশে র মধ্যে ফু রিয়ে যাওয়া র মানসিকতা পোষণ ক রেনি। ব রং স র্বহা রা হয়েও অন্ত রে র অন্তস্থর্লে ালিয়ে রেখেছে আশা র অনি র্বাণ দীপশিখা। তাই, রাধিকা যখন বলে, 'গাঁয়ে ফি রে যাবে, সে তো আমা র সৌভাগ্যি র কথা। কিন্তু কোথায় যা ব?............সেখানকা র মাটিও তো পুড়ে গেছে আমা র ভাগ্যে—যদি আমা র মাখন থাকত—'জ্বত্য়১ৰ কুঞ্জ তখন হতাশ রাধিকা র সামনে হাজি র ক রেছে এক বুক আশা, 'আশা হ বে বউ, স ব হ বে। দুঃখ ক রিস নে।' কুঞ্জ র এই আশা হতাশে র প্রতি স্তোক বাক্য নয়। এক বাস্ত ব বোধসম্পন্ন দূ রদর্শী মানুষে র আত্মবিশ্বাস। এই বিশ্বাসে র ওপ র ভ র ক রে কুঞ্জ গ্রামে ফে রে এ বং ফি রে পায় তা র পু রো সংসা র। তাই কুঞ্জ সম্পর্কে বলা যায়, সঠিক অর্থে যদিও কুঞ্জ ট্রাজিক চ রিত্র নয়, আ র ন বান্ন নাটকও ডোমেস্টিক নাটক নয়, তথাপি সে রাউণ্ড চ রিত্রে র অধিকা রী মানতেই হ বে।

'ন বান্ন' নাটকে নি রঞ্জন চ রিত্রটিও একটু গু রুত্ব দা বী ক রে। যদিও চ রিত্রটি র গতিপ্রকৃতি তেমন লক্ষণীয় নয়। সংসা রে র অভা বে সকলে র সন্দ্বেগ মিলেমিশে দুঃখ ভোগে র দার্ঢ্য তা র ছিলনা। দুঃখে র আতিশয্যকে সহ্য ক রতে না পে রে সে পালিয়ে গিয়ে উর্পাজনে র স্বতন্ত্র রাস্তা ধ রতে চেয়েছে এ বং ধ রেছে। কিন্তু পু রো গ্রামটা র সন্দ্বেগ তাদে র সংসা র ত রণীটি তখন হা বুডু বু খা২িছল, তখন স্বতন্ত্র জায়গায় ঝঞ্ঝা র থেকে পিঠ ফি রিয়ে দিন কাটা২িছল সে। তথাপি দুটি কা রণে চ রিত্রটিকে অল্পাধিক গু রুত্ব দেওয়া যেতে পা রে। প্রথমত, সে গ্রামে র চো রাচালানকা রী হা রু দত্ত এ বং দুশ্চ রিত্র কালো বাজা রী কালীধন ধাড়াকে বামাল সমেত ধ রিয়ে দেওয়ায় দুঃসাহস দেখিয়েছে। দ্বিতীয়ত, গ্রামে ফি রে গিয়ে ভাঙা সংসা রকে গড়ে তুলেছে, যে সংসা রে র আওতায় কুঞ্জ রাধিকা ফি রে গিয়ে পুন রায় পল্লী জী বনে র সুন্দ্র র সুনি বিড় ছায়ায় আত্মস্থ এ বং আশ্বস্ত হয়েছে। প্রধান সমাদ্দা র ফি রে পেয়েছে তা র বিপন্ন চৈতন্য। সে স্বস্তু অনুভ ব ক রেছে মা রি মন্বন্ত রে র বি রুদ্ধে জোড় প্রতি রোধে র সুদৃঢ় আশ্বাসে।

দয়াল চ রিত্রটি পূ র্বাপ র প রম্পর্য সম্পন্ন ক্র ম বিকাশমান চ রিত্র নয়। তাৎক্ষনিক চমকসৃষ্টি র এক বিশেষ প্রক্রি য়া প্রদর্শনে র ই২ছা র দ্বা রা চালিত সে। গূঢ় কোন ব্যঞ্জনা কিং বা দুঃখ আ র দুঃখ জয়ে র কোনো বলিষ্ঠ

মনোভাবের দ্বারা সে পরিচালিত হয়নি। নাটকের ভূমিকালিপিতে তার যে পরিচয় জানা যায় তাতে সে প্রতিবেশী মাত্র। অভাবের সংসার হলু, জমির উপর নির্ভরশীল জীবন। সে আর তার স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান 'রাঙা'কে নিয়ে তার সংসার। বন্যা এসে তার স্ত্রী ও পুত্রকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ভেঙে দেয় তার সাধের সংসার। কিন্তু তারপর গোটা গ্রাম ও গ্রাম্য মানুষদের জীবনে আকাল নেমে আসে এবং আকালের দুর্দান্ত আক্রমণে ঝনঝাহত পতন্দেগর ন্যায় বিপর্যস্ত হ২ছল, তখন সে কোথায় ছিল তা জানা যায়নি। অথচ তাকে পুনরায় দেখা গেল এই নাটকের প্রত্যাবর্তন পর্বে। তখন সে অনেকটা উদ্দী৫। গ্রাম্য মানুষদের দলপতির ভূমিকায় তখন সে দাঁড়িয়ে। কোথা থেকে এই উদ্দীি৫র অপর্যা৫ শশ্তি সে সঞ্চয় করল এবং গ্রাম্য জনতার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা সে কেমন ভাবে অর্জন করল তার তেমন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ এ নাটকে নেই। নাট্যকার শেষপর্বে তাকে দিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিয়ে নিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ রচনা, শস্য উঠিয়ে ধর্মগোলায় তোলার পরিকল্পনা রচনা ও তাকে কার্যকর করা এবং নবান্ন উৎসবের রূপরেখা অন্দ্বকনের অগ্রবর্তী ব্যাশ্তি হিসাবে প্রতিরোধের তেজঃদৃ৫ বশু ব্য প্রকাশের পুরোধা হিসাবে তাকে দাঁড় করিয়ে নাট্যকার হঠাৎ তাকে গুরুত্ব দিয়ে দিয়েছেন অনেকখানি। চরিত্রটা অতর্কিতভাবে অনেকখানি গুরুত্ব পাওয়ায় খাপছাড়া হয়ে গিয়েছে। বন্যার পর সে কোথায় কিভাবে ছিল জানা যায় না। সমাদ্দার পরিবার গ্রাম ছাড়ার পূর্বে তার ভূমিকা এতই গৌণ ছিল যে শেষ পর্যায়ে এসে তার ওই রকম বলিষ্ঠ ব্যাশ্তিত্বের ছবি খুব খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তবে 'মোমেন্টাম'সৃষ্টির ক্ষেত্রে চরিত্রটা যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে বলা যেতে পারে।

চোরাচালানকারী হারু দত্ত কালো বাজারী দুছরিত্র কালীধন ধাড়া এই নাটকের দুটি খল চরিত্র। খল অর্থে দুষ্ট প্রকৃতির চরিত্র। ইংরাজীতে যাকে বলে ভিলেন। এই নাটকে সমাদ্দার পরিবার এবং আমিনপুরের কৃষকেরা প্রগ্রেসিভ ফোর্স পজিটিভ শশ্তি আর হারু দত্ত কালীধন ধাড়া নেগেটিভ ফোর্স দুষ্টচক্র। এরা মজুতদার,দালাল, মানুষ, ও খাদ্যের বেআইনি ব্যবসাদার। ধূর্ত, মুনাফাখোর, পরশ্রমজীবী, সমাজের নোংরা লোক। নিজেদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য এরা পারে না এমন কাজ নেই। এরা দুজনেই আকাল কবলিত মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অবৈধ কারবারে লি৫ থাকে। কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিঘটিয়ে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলবার দুরভিসন্ধির জাল বিস্তার করে চলে।

হারু দত্তগ্রাম থেকে ধান এবং চাল কম দামে কিনে নিয়ে কালীধনের গুদামে তুলে দিয়ে আসে। কালীধন তা মজুত করে সময় মত বেশি দামে লোক বুঝে বিক্রি করে। সেই সন্দেগ হারু দত্ত গরিব গৃহস্থ ঘরের যুবতী মেয়েও ক্রয় করে কম দামে ও বেশি পয়সায় সরবরাহ করে কালীধনের সেবাশ্রম নামক নারী ব্যবসার এক অবৈধ কেন্দ্রে। তাছাড়া হারু দত্ত অভাবের সুযোগে জোতজমিও কিনে নেয় কম পয়সার বিনিময়ে। প্রধান সমাদ্দারের পরিবারকে পথে বসায় এই হারু দত্ত। বন্যা আর দুর্ভিক্ষের সংগ্রাম করতে করতে এই পরিবারটা যখন মুমূর্ষু, তখন সেখানে নেকড়ের থাবা বসায় সে। কুঞ্জর একটি সংলাপে এই চরিত্রটার কর্মপদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে যায়, 'টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ, লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার

জমি ধরে টান মারতে এয়েছে।' প্রয়োজনে এই হারু দত্ত, গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষকে ভগবানের ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়, 'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দেখাবে বলে, তা জানি।' কিন্তু সেসবে যখন কাজ হয় না, তখন সে স্বরূপ ধারণ করে,'উঁ, সোজা শিরদাঁড়াটা তা হলে এইবার তো দেখি এটুখানি বেঁকিয়ে দিতে হয়হ্ল, বেটা ছোটলোকের এত বড়ো আস্পর্দ্ধাঙ্গ' নিজের লোকজনদের ডেকে হুকুম দেয়, ' দে তো রে আ২ছা করেঘা দু-চার —' স্থ্র১ম অন্দ্বক, ৫ম দৃশ্যৰ আবার মেয়ে কেনবার সময়ে কৌশলপূর্ণ চাতুর্যের আশ্রয় নেয়। অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরে মেয়ের বাপকে। মেয়ে সংগ্রহের জন্য সে খুকির মায়ের মত মেয়ে দালাল ছড়িয়ে দেয়। তারা ফাঁকফোঁকর বুঝে তুলে আনে মেয়ের বাপকে। হারু দত্ত মারপ্যাঁচে ঘায়েল করে ফেলে তাকে। 'কিছু না, কিছু না। আমি দেখবো তোমার আপদে, তুমি দেখবে আমার বিপদে, এ না করলে চলবে কেনঙ্গ —কী বল চন্দ্রুর?' প্রথম শিকারকে সে চারিদিক থেকে ঘিরে ফ্যালে, তারপর তার ঘাড়ে কামড় বসায়, 'দু- চোখের সামনে সব না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে, এ দেখতে পারব না বলেই তোঙ্গ' তারপর হর হর করে বিষ ঢেলে দেয়, 'তা সব না, সব খারাপ না, ভালো লোক পৃথিবীতে আছে। ...... তারাই তো চালা২ছ এই জগৎটা। এ বন্বিধ প্রকারে কাজট হাসিল করে নেয়, 'ন্যাও এসো এইবার টিপ্ সইটা দিয়ে যাও, এসো এসো।' মেয়ে বিক্রির কোবালায় টিপসইটা দিইয়ে নেয় আটঘাট বাধবার জন্যে, 'মানুষের মুখের কথায় জানবে চন্দ্রুর কোন মূল্য নেই, একেবারে কিছু দাম নেই— কথা এই বললে ফুরিয়ে গেল ঙ্গ না কিঙ্গ করবে যা তা সব কাগজে কলমে।..... চেপে দ্যাও আন্দ্বগুলটা, হ্যাঁ, য়্যাঁ।'

স্থ্র২য় অন্দ্বক,৪র্থ দৃশ্যৰ

হারু দত্ত শঠ, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ধূর্ত এবং জালিয়াত। নাট্যকার অতিযত্নে চরিত্রটা গড়ে তুলেছেন। নিপুনভাবে তার মুখে সংলাপ বসিয়েছেন এবং অন্দ্বগাভিনয়ের যথেষ্ঠ সুযোগও রেখেছেন। ফলে চরিত্রটা হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

কিন্তু সেই তুলনায় কালীধন ধাড়া অতটা ফুটে উঠতে পারেনি। সাধারণত মজুতদাররা একটু মোটা বুদ্ধির হয়, বুদ্ধির চেয়ে টাকার জোরটাই তাদের বেশি। কালীধন প্রচুর টাকার মালিক। বিরাট কারবার তার। প্রচুর চাল গুদামজাত করে রেখেছে সে। বলা বাহুল্য দেশের আপৎকালীন অবস্থায় 'ভারত রক্ষা আইন' বলে মন্বন্তরের বাজারে এই মজুতদারী একেবারে বে-আইনি, দণ্ডনীয় অপরাধের সামিল। এহেন গুদাম সংরক্ষণের এবং দেখাশোনার ক্ষেত্রে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা দরকার ছিল, কিন্তু কালীধন সেই সতর্কতা অবলম্বন করেনি। দ্বিতীয়ত নারী ব্যবসার কেন্দ্র সেবাশ্রমটির দিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কালীধন সে প্রয়োজন বোধ করেনি। তার অর্থ প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু দুরদর্শিতার ছিল একান্ত অভাব। তার ধারণা ছিল তার নৌকার পালে যে সুসময়ের হাওয়া লেগে নৌকাটি তরতর করে সমৃদ্ধির উজানে ছুটে চলেছে এর কখনো কোনদিন ব্যত্যয় ঘটবে না এতোখানি নিছিন্ত হওয়ার জন্য সে নিরঞ্জন বিনোদিণীর জালে জড়িয়ে পড়ল এবং একেবারে ভরা ডুবি হয়ে গেল। তৃতীয়ত, হারু দত্তের সন্দ্বেগ বুদ্ধির কসরতে সে এঁটে উঠতে পারে নি। হারু দত্তের দশ ঘাটে জল খাওয়া ঘোড়েল লোক। বুদ্ধি তার পাকা, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী এবং তীক্ষ্ণ

ও দ্রুতগামী। তা র সন্দ্বেগ বুদ্ধির কস রৎ ক রতে গিয়ে প রাজিত হয়েছে কালীধন। উদ্দেশ্য সিদ্ধক র বা র জন্য হা রু দত্ত অনেক কথা খ রচ ক রে, কিন্তু সেই কথাগুলোকে সে কথা র কথা বলে ধ রে নেয়। কালীধন কিন্তু চালাকচতু র নয়, কথা র চাতুর্য তা র তেমন নেই, কথাও তেমন বুদ্ধিদৃ৫ নয়। নাট্যকা র গভী র পর্যবেক্ষণ শশ্তি দিয়ে এই দুটি চ রিত্র গড়ে তুলেছেন।

নাট্যকারে র চ রিত্রসৃষ্টি র নৈপুণ্য আ র একটি চ রিত্রে র প্রতি দৃষ্টি দিলে সহজে ধ রা পড়ে। চ রিত্রটা খু ব ছোট, স্বল্প প রিসরে আ বর্তিত হয়ে টাইপ চ রিত্রে র 'ফ রমুলাকে পালন ক র বা র চেষ্টা করেছে। চ রিত্রটা র নাম রাজী ব। রাজী ব পূ র্ব বন্দ্বগ বাসী। নাটকে র প্রেক্ষাপট ও চ রিত্র প রিকল্পনা র আদর্শ ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পূ র্ব বন্দ্বগীয় ভাষায় কথা বলে সে। কয়েকটি তুলি র টানে এই ছোট চ রিত্রটা জী বন্ত হয়ে উঠেছে। চ রিত্রটা প্রথম সংলাপ উ২চা রণ ক রে হাই তুলে তিনতুড়ি বাজিয়ে, ' রাধে গো বিন্দ্রূ বল মন।' অথচ এই গো বিন্দ্রে র জী বটি মানুষে র ক্ষুধায় তী ব্র ব্যন্দ্বগ ক রে, 'চাল খায়। বড় চাল খাউন্যাঙ্গ চাল খাইতে আইছেঙ্গ দুর্ভিক্ষে র পোকামাকড় যত স ব। দুর্ভিক্ষে র বাজারে মানুষ যে মানুষ নেই, অন্নে র হাহাকারে পাগল হয়ে গেছে স বাই, কালীধনে র গদিতে স রকারে র চাকরি ক রতে ক রতে তা তা র জানা হয়ে গেছে। কালীধন এ বং তা র সান্দ্বগপান্দ্বগ রা ছাড়া ক্ষুধার্ত জনগণ মানুষ কিনা সে সম্পর্কে তী ব্র সংশয় প্রকাশ ক রে সে, 'আ রে কালীধন, এগুলো কী মানুষ।' তাই ক্ষুধা র চাল না পেয়ে তা রা যখন ক্ষি৫ স্ব রে কথা হলে তখন সে কালীধনে র হয়ে প্র বল তা২িছল্যে র সন্দ্বেগ কথা বলে, 'দে দ্যাখ —আ বা র চোখ ভ্যাটকায়ঙ্গ দেদে গলাটা ধইর‌্যা বা র কইর‌্যা দোকান থিহ্যা রাখহ রি।' জ্ম২/১ৰ ক্ষুধার্ত মানুষ সম্পর্কে তা র শেষ সিন্ধান্ত, 'দুর্ভিক্ষে র কাঙালি যত স ব, ম রা র আইস্যা প রছে শহ রে— কিং বা বিনোদিনী র সন্দ্বেগ সে বাশ্রমে নি রঞ্জনকে কথা বলতে দেখে স বিস্ময়ে বলে, ' রাখহ রিঙ্গ সুট সুট কইর‌্যা ঘ রে ঢুইকা ইয়ারে কয় কিডা রে, য়্যাঁ.....চুপ কই রা আছস অহন, কথা সে কস্ না বড়ঙ্গ.....ভা বস বুইড়্যা কিছু ঠাহ র পায় না, না বেটা প্রেমালাপ ক রনে র আ র জায়গা পাইলা নাঙ্গ জ্ম১/৫ৰ তা র ধা রণা এ বং বিশ্বাস প্রেম ভাল বাসা কালীধনে র ব্যশ্তি গত এশ্তি য়া র, এসবে আ র কা রো অধিকা র নেই। তাই সে নি রঞ্জনকে শাসায়, 'সিংহ র মুখে খাদ্য আ র তুই শৃগাল হাত দিছিস তাইতেঙ্গ বা বু তো রে আজ কী ক রে দেহিসনে.... বেটা ছুটলোক আস্পর্ধা পাইলে কী আ র রক্ষা আছে নাঙ্গ' আ বা র বিনোদিনী যখন ঘ রে র বাইরে যেতে চায় তখন তাকে গিয়ে বাধা দেয়, 'আ রে এইডা কী ক র ঙ্গ তুমি মাইয়া মানুষ তোমা র স্টথান হইল অন্দ্রূ রমহলে। বাইরে যা বা ক্যান। যাও ভীতরে যাও।— কী আশ্চর্যঙ্গ' জ্ম২/৫ৰ

রাজী ব বৃদ্ধকিন্তু বয়সে র ভা রে ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি সে। অন্ত্যন্ত ক রিৎকর্মা। কর্তা র বিক্র ম প্রকাশ ক রতে পঞ্চমুখ সে। নিজে র প্রভূত্ব খাটাতে সে খু ব তৎপ র। কালীধনে র সে বাশ্রমে র ক্রি য়াকাণ্ড তা র জানা। এখানে যে সমস্ত স্ত্রী লোকে রা তাদে র প্রতি অন্য কা রো দৃষ্টি পড়াটা সে যেমন ব রদাস্ত ক রতে পা রে না, ঠিক সেই রকম এখান থেকে কোনো স্ত্রীলোক বে রিয়ে যেতে চাইলে সে সতর্ক প্রহ রী র মতো বাধা দেয়। চ রিত্রটি র মধ্যে খু ব গভী রভা ব এ বং ভা বনা র চিহ্ন পাওয়া যায়না। হালকা —উপ রিস্তু রে ভাসন্ত এই চ রিত্রটা নাট্যকা র অতি যত্ন সহকারে গড়ে তুলেছেন। কথা বার্তা, হালচাল, আদ বকায়দা র মধ্যে বৈচিত্র্যে র সৃষ্টি ক রে চ রিত্রটিকে

খুব উপভোগ করে তুলেছেন বলতে হবে।

উপরোক্ত চরিত্রগুলো ছাড়াও 'নবান্ন' নাটকে স্ত্রী চরিত্র আছে কয়েকটি। যেমন, পঞ্চাননী, রাধিকা এবং বিনোদিনী ইত্যাদি।

পঞ্চাননী প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী। আমিনপুরের বৃদ্ধা মহিলা। স্বাধীনতা আন্দোলনে আমিনপুর তথা মেদিনীপুরের একটা বিশেষ একটা ভূমিকা ছিল। গান্ধী বুড়ি মাতাঙ্গিনী হাজরার ভূমিকা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সম্ভবত এই ঐতিহ্যের পথ ধরে পঞ্চাননী চরিত্রটি নবান্ন নাটকে এসেছে। প্রধান সমাদ্দারের উপযুক্ত স্ত্রী সে। আগষ্ট আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার মানসিকতা ঘিরে শাসক শ্রেণীর অত্যাচারে ভয়ে ভীতু আমিনপুরের মেয়েরা লাশরম খুইয়ে বনে জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকে শুধু আত্মরক্ষার জন্য। এর চাইতে অপমানের কিছু আছে? পঞ্চাননীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর থেকে শোনা যায়— বলি তোদের এই অক্ষমতার জন্যে মেয়ে মানুষ কেন সহ্য করতে যাবে এই দুর্ভোগ? জ্ব১/১ব.....সব চাইতে বড়ো কথা ই৭ ৎঙ্গঙ্গ মেয়ে মানুষের ই৭ ৎঙ্গঙ্গ' জ্ব১য়১০ব— উত্তরে কুঞ্জর কাছ থেকে কোনো ইতিবাচক বশু ব্য না শুনতে পেয়ে পঞ্চাননী স্বয়ং একটা জনতাকে নেতৃত্ব দেয়। তাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। পুলিশের মার খেয়ে পলায়নপর জনতাকে মারমুখি করে তুলে বিশেষ সাহস ও শক্তি মত্তার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু জীবনী শক্তি তখন তার খুব কম অংশই অবশিষ্ট ছিল, তাই বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। নাটকীয় চরিত্র হিসেবে নাট্যকারের এটি একটি অনবদ্য সৃষ্টি বলতে হবে।

বিনোদিণী সুসংগত, সংযত এক গ্রাম্য বধূর সু-অন্বিকত চরিত্র। সমাদ্দার পরিবারের কনিষ্ঠ বধূ লা৭ শীলা ধী-শক্তি সম্পন্না। স্বামী নিরঞ্জন তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও সে এই পরিবারের সন্দেগ একাত্ম হয়ে দুঃখবেদানার সমান অংশীদার হয়ে এই পরিবারের সন্দেগ অবিচ্ছিন্ন থেকেছে। তাঁর একটাই বেদনা—স্বামী নিরঞ্জন সংসারের সংকটে সকলেই যখন ঝালাপালা তখন বিনোদিনীর পাশে থেকে,দুঃখ বরণের সহমর্মী হয়ে, মানসিক স্বস্তি ও আশ্বাসের স্থল হওয়ার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা না নিয়ে দেশান্তরে চলে গেছে। শতমান অভিমান অনুরোধেও কর্ণপাত করেনি। তাঁর নারীসত্তার এ অবমাননা বড় বেদনাদায়ক। অতঃপর পরিবারের সকলের সন্দেগ গ্রাম ত্যাগ করে শহরে এসে অতর্কিতভাবে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এক টাউট তাকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে এনে তুলে দেয় কালীধনের সেবাশ্রমে। এখানে ঘটনা চক্রে সে মিলিত হয় স্বামী নিরঞ্জনের সন্দেগ। নিরঞ্জন রাখহরি নামে সেখানে কালীধনের কর্মচারী। নিরঞ্জনকে বিনোদিনী সেবাশ্রমের সমস্ত বিবরণ দেয় এবং কৌশলে কালীধন ধাড়া ও তার সরকার রাজীব সমস্ত বামাল সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তারপর বিনোদিনী নিরঞ্জনকে নিয়ে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে এবং ভেঙে পড়া ঘর ও অগোছালো সংসারকে সে পুনরায় গড়ে তোলে। বিনোদিনী একটি সুঅন্বিকত গ্রাম্য বধূর চরিত্র।

রাধিকা নবান্ন নাটকের সবচেয়ে বড় স্ত্রী চরিত্র। কুঞ্জর স্ত্রী এবং সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ। একটি সন্তানের জননী। এই চরিত্রটির তিনটি অংশ। পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ হিসাবে সে খুব দায়িত্বশীলাহু, সকলকে একসন্দেগ নিয়ে চলবার মনোবাসনা তার অকৃত্রিম। অভাবের সংসারে ছোটখাটো ঝগড়াবিবাদে যেমন জড়িয়ে

পড়ে, তেমনই দুঃখের সংসারকে সুখের করে তোলবার ঐকান্তিক আগ্রহে ভরপুর। দ্বিতীয় অংশ শহরের ফুটপাত বাসিনী। এই অংশে ক্ষুধার সন্দেগ তীব্র সংগ্রাম রত সে । কিন্তু ক্ষুধার লেলিহান শিখা তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বামী ভক্তি ও স্বামীপ্রেমকে খাক করে দিতে পারেনি। বরং তা আরো গাঢ় হয়ে উঠতে দেখা গেছে। কুঞ্জর হাতে কুকুরে কামড়াবার দৃশ্যটি এই বক্তব্যকে সমর্থন করবে। কুকুরে কামড়াবার অব্যবহিত পরে রাধিকার অন্তরের অভিব্যক্তি ধাপে ধাপে গভীর থেকে গভীরতম স্তরে পৌঁছেছে। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া 'একেবারে কামড়ে খেলে গো'র অনিবার্য সাধারণ গ্রাম্য নারীসুলভ প্রকাশ—'ভারি পাজি কুকুর তো। .....দূর হা রামজাদা লক্ষ্মীছাড়া কুকুর। ঝাঁটা মারো মুখে, ঝাঁটা মারো।' বক্তব্য বিষয় অনেকটাই অমার্জিত Crude । এটি যখন অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করে, তখন 'ওমা এ যে অনেকখানি কামড়ে নিয়েছে দেখছি। ওমা আমার কী হবে গো।' ঘর বার যখন একাকার ,তখন তার এ উপলব্ধি অন্তরে যে অসহায়তা তারই প্রকাশ উপরোক্ত অংশে। বোধ করি স্বামী কুঞ্জর যন্ত্রনাকাতর মুখ লক্ষ্য করে, তার চৈতন্যের গভীরে যে উপলব্ধিতা থেকেই বেরিয়ে আসে, 'খুব যন্তনা হচ্ছে, নাঙ্গ জল এনে দেব জল? একটু জল খাবে?— এ যেন নতুন করে স্বামী প্রেমকে ফিরে পাওয়া, নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার। তারপর ফিরে এসেছে স্বামীর হাত ধরে নিজেদের গ্রামে। তৃতীয় অংশ গ্রামপ্রীতি। গ্রামে প্রত্যাবর্তনের জন্য তার অন্তরে একটা ইচ্ছা সুপ্ত ছিল। তাই কুঞ্জ যখন প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করে, রাধিকা তৎক্ষণাৎ তা সমর্থন করে। সেই মুহূর্তে তার অন্তরে শাশ্বত মাতৃত্বের জাগরণ ঘটে। মৃত পুত্র মাখনের জন্য তার সমস্ত অন্তর হাহাকার করে ওঠে। কিন্তু গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে সে সমস্ত কিছু ভুলে নতুন করে গড়বার আনন্দে আবার মেতে ওঠে। এই অংশের রাধিকাকে আমরা আবার প্রথম অংশের রূপে দেখে মুগ্ধ হই। রাধিকা 'নবান্ন' নাটকের একটি অনবদ্য নারী চরিত্র। নাট্যকার এই চরিত্রটি গভীর নিষ্ঠা ও পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে গড়ে তুলেছেন।

৪৮.১২ 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ ও গান

নাটক সংলাপ নির্ভর। সংলাপের ওপরেই নাটকের নাটকীয়তা, সংলাপের মধ্যে দিয়েই নাটকের বিষয় বস্তু বর্ণনা, সংলাপের মধ্যে দিয়েই নাটকের দ্বন্দ্বতসংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা, নাটকীয় বৃত্তগঠন, চরিত্রের বিকাশ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি নির্ভর করে। সাহিত্যে অন্যান্য প্রকরণগুলিতে রচয়িতার এক নিজস্ব কলম থাকে, যে কলমে তিনি কিছু বর্ণনা, কিছু বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে কাহিনী, চরিত্র, প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিকতা, স্থান ও কালের অনেকখানি পরিচয় দিয়ে থাকেন। নাটকে কিন্তু নাট্যকারের সে সুযোগ নেই। নাট্যকার এ সমস্ত কিছুই সংলাপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন। নিজে করতে গেলেও নিজেকে প্রথম চরিত্র করে তুলতে হবে, তারপর অন্যান্য চরিত্রের সন্দেগ সন্দগতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে যুক্তি গ্রাহ্য পথে সংলাপ উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে এ কাজগুলি করে থাকেন।

সুতরাং নাটকের ,সংলাপ যেমন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনই এর রচনা পদ্ধতির প্রতি রচয়িতার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়? সচেতন মনের সযত্ন প্রয়াসেও অতিরিক্ত সাবধানতা গ্রহন

করতে হয়। মনের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরগ্রাম্যভিত্তিক সংলাপ রচনা করতে না পারলে নাটক প্রার্থিত ফলদানে সক্ষম হয়না। মনের বিভিন্ন-ভাব-অনুভাব বিভাব, সঞ্চারী ভাবকে বিভিন্ন গ্রামে নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত স্বর সহযোগে নিক্ষেপ করতে হয়, তাহলেই নাটক থেকে উপচিত হবে যথেষ্ঠ উপভোগ্য নাট্যরস। এই সংলাপের মধ্যেই নিহিত থাকে বাচিত অভিনয়ের বহুবিধ উপকরণ, আবার এই সংলাপের মধ্যেই অনুল্লেখিতভাবে জড়িত থাকে অন্দগাভিনয়ের নানা নির্দেশ। যেমন, 'চলে যাও' বললে এক রকমের অন্দগাভিনয় হবে, আবার যাও, তুমি চলে যাও, তুমি চলে যাও' বললে অন্দগাভিনয়ের ধরনটা যাবে বদলে,আবার, 'যাও, যাও চলে যাও' বললে তার অন্দগাভিনয়টা হবে অন্য রকম।

এই যে নাটকে দ্বিবিধ অভিনয় তা সংলাপের ওপরেই নির্ভরশীল। তাই যে নাট্যকার যত বেশি ভাল সংলাপ রচনা করতে পারেন, সেই নাট্যকারের নাটক রসিক মহলে তত বেশি সমাদৃত হবে। সেই নাট্যকার কালের দেওয়ালে হাত রাখতে পারবেন। এমন অনেক সময় দেখা গেছে যে , হালকা সংলাপের নাটকে সুদক্ষ অভিনেতাও, সুনাম অর্জন করতে পারেননি, কিন্তু ভাল সংলাপ সংযুক্ত নাটকে তৃতীয় স্তরের অভিনেতাও অতি সহজে দারুন অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করে কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি সংলাপই নাটকের প্রাণ। তাকে আশ্রয় করেই নাটকের চরিত্রেরা চলাফেরা করে, তারা পরিস্ফুট হয়, বিকশিত হয়। তাই সংলাপ হওয়া উচিত স্বাভাবিক কথা ভাবানুগ, চরিত্রানুগ ও সংক্ষিপ্ত। এই ধরনের সংলাপ রচনার সূত্রপাত করেন মধূসূদন। তিনি একটি চিঠিতে কেশবচন্দ্রকে লিখেছিলেন, I shall endeavour to creat characters who speak as nature suggests and not mouth mere poetry. — অর্থাৎ চরিত্র স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে, কাব্যাংশ আওড়াবে না। তার পরিচয় পাওয়া গেল মধুসূদনের প্রহসন দুটিতে— 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' আর 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে। কৃষ্ণ কুমারিতে এসেছে কথ্য রীতি। সংলাপ উচ্চারণের কাল হয়েছে দ্রুত, দ্বন্দ্বমথিত তীব্রতায় সংলাপ চরিত্রকে ব্যক্ত করেছে। সংলাপগুলির ভাষায় চরিত্রগুলির ব্যক্তি পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। মধুসূদনের প্রহসন দুটির সংলাপ ত্রুটিমুক্ত , প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষতা ঘটনাগত ও অনুভূতিগত। সংলাপ, সংস্কৃত নাটকের সংলাপ রীতি অনুযায়ী বিবরণধর্মী না হয়ে বক্তব্যের বাহন হয়েছে। বগতোক্তি প্রায় বর্জিত, যা আছে তা সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ। সর্বোপরি সংলাপ হয়ে উঠেছে চরিত্রের দর্পণ। 'একেই কি বলে সভ্যাতা'র থেকে একটি উদাহরণ তুললে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত হবে। নায়ক নবকুমারের ইয়ার কালী নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে, 'কি পরিচয় দেব বলো দেখি ভাই? তোমাদের কর্তাকে কি বলব যে আমি বিএরের র —মুখটি—স্বকৃতভন্দগ— সোনাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না, শ্বশুর নয় —শত শাশুড়ির আলয়, আর উইলসনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই—'

অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের সংলাপ প্রতীক আর রুপকধর্মী। কাব্যরসাশ্রিত প্রতীকধর্মী সংলাপ রচনার যাদুকর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এক অসম্ভব রকমের নিজস্বতার স্বাতন্ত্র্যে তিনি উদ্ভাসিত। তাঁর সংলাপ অনেক সময় তরন্দ্বগায়িত বলে মনে হতে পারে। সহজ সরল শব্দগুলিকে তিনি এমনভাবে সাজান যে তার থেকে

কা ব্য ঝরে পড়ে। লোক প্রচলিত বাজা র চলতি শব্দের ব্য বহা র না থাক বা র দ রুন একটা মার্জিত রূপ গড়ে ওঠে। কবি র মনোলোকের গভী র তলদেশ থেকে উৎসারিত হয় শব্দত রন্দ্বগ, সংলাপের মধ্যে আনে এক বোধসম্পন্ন অনুভ ববেদ্য আবেশ। শ্রীশম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের সংলাপ সম্পর্কে বলেছেন, জী বন প্রতিম বলে চিনতে পা রা র মতো সমস্ত বিশিষ্টতা আরোপ করেও সাধা রণ প্রতীকী চেহা রাটা তিনি অক্ষুন্ন রাখতে পা রতেন।' প্রসন্দ্বগক্র মে 'রশু ক র বী', 'মুশু ধা রা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অথ বা 'কালের যাত্রা' প্রভৃতির সংলাপের কথা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপের প্রসন্দ্বেগ একটা কথা বললেই যথেষ্ট হবে, তিনি নাটকের সংলাপ লিখতেন কবি র কলমে।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দী র চল্লিশের দশক থেকে সংলাপ রচনা র ক্ষেত্রে আশ্চর্য রকমের বি বর্তন ঘটে গেছে। সংলাপের চরিত্রের পরি বর্তন ঘটে গেছে আমূল। মধুসূদন, দীন বণ্ডধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপ থেকে এই সংলাপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দর্শক এ বং চরিত্রের তফাৎটা ভেঙে ফেলে পা রস্প রিক সাযুজ্য সন্ধানে নতুন রীতি ও কৌশল অ বলম্বিত হয়েছে বাংলা নাটকের সংলাপ রচনায়। আম রা পা র হয়ে এসেছি—

'গর্ব, মান, বী র-অহন্দ্বকা র—
পাণ্ডবের তুমি হরিঙ্গ
আদেশে তোমা র
অশ্বমেধ হইয়াছে আয়োজন,
না রায়ণ, নাহি লয় মন
তাহে কভু বিঘ্ন হবে।' জ্বগিরিশচন্দ্রৰ

কিংবা, 'তুমি দেখতে পা২েছা না দুর্যোধন, কিন্তু আমি দেখতে পা২িছ ঐ আগুনের শিখা লক লক করে আকাশ ছেয়ে ফেলল, ঐ আর্তনাদ, ঐ হাহাকা র—হাঃ হাঃ হাঃ— জ্বঅপরেশচন্দ্রৰ

কিংবা, '—ঐ সূর্য্য অস্ত যা২েছ। দিবা র চিতাগ্নি তা র চা রদিকে ধূ ধূ করে্লে উঠেছে। কাল আবা র ঐ সূযর্হ্ল উঠবে। উঠুকঙ্গ একদিন আসবে, সেদিন ঐ সূর্য্য আ র উঠবে না। ঐ জ্যোতি ক্র মে ক্র মে শীর্ণ, মলিন, ধূস র হবে যাবে। তা র পাংশু রশু বর্ণ ধূম পৃথি বী র পাণ্ডু র মুখের ওপ র এসে পড়বে। তা রপ র তাও পড়বে না। কৃষ্ম সূর্য্য অনন্ত শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কি গরিমাময় দৃশ্য সেই? — কে?' জ্বদ্বিজেন্দ্রলালৰ

অথ বা, 'সামনে তোমা র মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আ র পিছনে তোমা র কালো চুলের ধা রা মৃত্যু র নিস্তব্ধ ঝ রনা। আমা র এই হাত দুটো সেদিন তা র মধ্যে ডু ব দিয়ে ম র বা র আ রাম পেয়েছিল। ম রণের মাধুর্য আ র কখনো এমন ভাবে ভাবিনি। সেই গু২ছ গু২ছ কালোচুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ই২ছা ক রছে। তুমি জান না, আমি কত শ্রান্ত। জ্বরবীন্দ্রনাথৰ

এ সমস্ত সংলাপ অতিক্র ম করে চল্লিশের দশক লিখছে, 'হেঃ, এ রশুে র আ বা র দামঙ্গ এ রশুে র জন্যে আ বা র মায়াঙ্গ জন্তু জানোয়ারের মতো বনে জন্দ্বগলে যাদের পালিয়ে পালিয়ে বাঁচা — ও বেশ হয়েছে কুঞ্জ, তুই আমারে ছেড়ে দে।— আমা র অন্ত র্লে গেছে রে কুঞ্জ, আমা র অন্ত র—

কুঞ্জ।　অন্তর কার জলেনি, আমার না?

প্রধান।　ক্ষুব্ধ স্বরে লেছে তো এগুলি নি কেন যখন বল্লাম? এগুলি নি কেন? কেন এগুলি নি তুই? তোর অন্তর যদি —আমার শ্রীপতি-ভূপতি—

কুঞ্জ।　শ্রীপতি-ভূপতি ব্যথা বড় কম বাজে নি এই বুকে, জানলে জেঠা তবে তুমি শুধু বার বার ঐ নাম দুটো করে মিথ্যে শান্তি পেতে চাও, আর আমি ভেতরে ভেতরে দগ্ধে মরি, এই তফাৎ।—

এই সংলাপ যেন প্রত্যক্ষ জীবনের উত্তপ্ত ক্ষেত্র থেকে উঠে এসে রূপ নিয়েছে ফোঁটা ফোঁটা রক্তে। অদ্ভুত রকমের জীবন্ত, বাস্তব, স্বাভাবিক। বাস্তবধর্মী জীবনের উষ্ণতায় ভরা অথচ মেদবর্জিত, বহুবর্ণ অননুরঞ্জিত পেলবতাহীন, অপ্রলম্বিত মৃত্তিকাশ্রয়ী মৃত্তিকাগন্ধী সংলাপ। সর্বনাশা সন্দকটের বিরুদ্ধে প্রতিকারহীন প্রতিরোধস্পর্ধী আত্মার উত্তপ্ত গ্লানির কেন্দ্রস্থল থেকে উঠে এসেছে,— 'ঐ হয়েছে এক কিন্তু, সব কথার ভেতরে ঐ কিন্তু হঠাৎ উদভ্রান্তের মত ছুটে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরে কুঞ্জর ঐ কিন্তুটার টুঁটি একবার, মরিয়াভাবে কিন্তুটা-রে একেবারে শেষ করে ফেলে দেই। একেবারে শেষ করে ধস্তাধস্তি —'

কুঞ্জ।　জেঠা, জেঠা, কী হচ্ছে, কী কর? জেঠা জেঠা কুঞ্জর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে প্রধান

প্রধান।　হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে য়্যাঃ

কুঞ্জ।　জেঠা

প্রধান।　আমার অন্তর লে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর লে গেছে।

চল্লিশের দশকে 'নবান্ন' ছড়িয়ে দিচ্ছে জীবনের ঊষর ক্ষেত্রের ওপর দণ্ডায়মান কতগুলো মানুষের মনে প্রতিরোধের স্পৃহায় মুমূক্ষু আত্মার মর্মবাণী, 'আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস। পেছোস নি, এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।'

এ সংলাপ যেন নাট্যকারের নয়, এ সংলাপ চরিত্রের। এ চরিত্র নাট্যকার সৃষ্ট চরিত্র নয়, সময়ের ঝঞ্ঝাবর্তে ব্যতিব্যস্ত কৃষিভূমিতে দণ্ডায়মান অকালগ্রস্ত, অথচ ভাগ্যবাদী চরিত্রও নয়, বরং বাস্তববোধের দ্বারবিদীর্ণ কতকগুলি জীবন্ত মানুষ। 'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে, তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছেচ ওতে আর ভয় করি নে।' সংলাপ তাই উঠে এসেছে সত্যকথনের দৃঢ় প্রত্যয়ের অন্তঃস্থল ঠেকে 'টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে। এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েচে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।' অত্যাচারী লুণ্ঠনস্পৃহ দানবের বিরুদ্ধে চাষাড়ে রুক্ষ টগবগে হুংকার ছোড়ে, 'হেত্তেরি শালা নিকুচি করেছে তোর ঝামেলার—

সংলাপের শব্দগুলো লক্ষ্য করবার মতো এসব শব্দের জন্মভূমি নাট্যকারের মনোজগৎ নয়, গ্রাম বাংলার কৃষক মজুরের ঘরকন্নার মধ্যে, মাঠ ঘাট পথ প্রান্তরের মধ্যে এর অস্তিত্ব। তাদের আনন্দ-উৎসব, পালপার্বণ, সুখদুঃখ, যন্ত্রণা হাহাকার, রাগদ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা, ক্রোধ এবং ক্রোধোন্মত্ত অন্তরের উত্তপ্ত ক্ষেত্র থেকে রচনায় এসেছে শব্দের মণিমাণিক্য।

গ্রামের চাষী মজুরের ভাষা ও শহর কোলকাতার আটপৌরে ভাষার অস্তিত্বও দেখা যাবে 'নবান্ন' নাটকে।

আবার পূর্ববাংলার উপভাষা এই নাটকে এসে গেছে রাজীবের মুখে। এ ছাড়া আরবী, ফার্সি শব্দ এসে গেছে। মোটের ওপর এই চার রকমের ভাষার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ।

'নবান্ন' নাটকের গঠনগত একটা বিশেষত্ব— প্রায় প্রতিটা দৃশ্যে একটা করে চরম মুহূর্ত গড়ে তোলা হয়েছে দৃশ্যান্তে। সেই চরমমুহূর্ত গড়ে উঠেছে সংলাপের অদ্ভুত ঠাসবুননে—

জ্বউন্মত্ত অবস্থায় নেপথ্য থেকে দয়াল 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক দেয়ৰ

কুঞ্জ। জ্বউৎকর্ণ হয়েৰ য়্যাঃ.....কুঞ্জঙ্গ .....কেঙ্গ

ডউন্মত্ত অবস্থায় দয়ালের প্রবেশ

দয়াল। কুঞ্জ,কুঞ্জ, কুঞ্জঙ্গ

কুঞ্জ। দয়ালদা। কী হয়েছে দয়ালদা?

দয়াল। জ্বস্বপ্নোত্থিতের মতোৰ য়্যাঃ, কোনো কিছু ছিল নাকি আমার কোনো দিন? ছিল কি কেউ? কোথায় গেলঙ্গ আমার কি কিছু ছিল নাঙ্গঙ্গ

কুঞ্জ। রাঙার মায়ের জন্যে যে তুমি।

দয়াল। রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙাঙ্গ আমার ঘর, কোথায় গেল আমার ঘরঙ্গ বুঞ্জঙ্গঙ্গ

প্রধান। দয়ালঙ্গঙ্গ

দয়াল। প্রধান, সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল.....সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মাঙ্গঙ্গ

বিস্ময়ে বিমূঢ় করে তোলে আটপৌরে ঘর-কন্নার ভাষাকে দিয়ে কি অদ্ভুত ভবে ক্লাইমেক্স গড়ে তুলেছেন নাট্যকার। বন্যায় দয়ালের ঘর বাড়ি স্ত্রী-পুত্র গোটা সংসারটা ভেসে গেছে। সেই যন্ত্রণার হাহাকার বেরিয়ে এসেছে তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে কুঞ্জ কুঞ্জ ডাকের মধ্যে। দর্শক অতর্কিতে ওই আর্তনাদে চমকে চমকে ওঠে। নাট্যকার প্রধান শব্দটা ব্যবহার করলেন না, কেন না, কুঞ্জ শব্দটার ভেতর অভিনেতা, আতন্দ্বিকত কণ্ঠস্বরের ঢেউটা খেলাতে পারবেন, যে ঢেউ দর্শক মনে উত্তাপ তরন্দ্বগ তুলবে। আর একটি শব্দ 'সমুদ্দুর'। সমুদ্র বললে স্বরক্ষেপের কালসীমা যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, 'সমুদ্দুর তারও চেয়ে অনেক বেশি হয়। অভিনেতা কণ্ঠস্বরকে অনেকখানি দর্শকমনে গভীর ছাপ ফেলবার সুযোগটা পেয়ে যান।

হারু দত্তের সরীসৃপ মন লালাসিক্ত রসনায় উচ্চারণ করে অদ্ভুত সংলাপ, 'হেঃ, হেঃ ছেলেমানুষ কিনাঙ্গ' প্রস্থান রতা বিনোদিনীর দেহের প্রতি লোলুপতা প্রকাশের পক্ষে ওইটুকু সংলাপই যথেষ্ট। কিংবা কুঞ্জকে যখন হারু দত্তের লোকজন লাঠিপেটা করছে প্রধানের সংলাপ তখন তৈরি করছে অদ্ভুত 'সিকোয়েন্স', 'মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।' —সংলাপের ওপর অভিনয়, দর্শক মনে গভীরভাবে দাগ কেটে যাওয়ার মতো। আবার তিনটি শব্দের বিচ্ছিন্ন উচ্চারণে প্রেক্ষাগৃহ উত্তাল আবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাখনের মৃত্যুদৃশ্যে কুঞ্জের আর্তনাদ, 'য়্যাঃ মাখন, মাখন—' লক্ষ্য করবার মতো শব্দগুলো

মোটেই আবেগময় নয়। আবেগ উ২৬৩াস বর্জিত। এই ধরনের সংলাপ রচনা করে নাট্যকার তাঁর নবান্ন নাটকের বিশেষত্ব মণ্ডিত করেছেন।

রাজীব পূর্ববন্দ্বগীয় উপভাষায় অদ্ভুত অমানবিক ধরনের সংলাপ উ২চারণ করে, যাতে তার প্রতি দর্শকের ঘৃণা এবং ক্রোধ যুগপৎ বেরিয়ে আসে। 'দে দ্যাখ— আবার চোখ ভ্যাটকায়ঙ্গ দেচে গলাটা ধই র‍্যা বার কই র‍্যা দোকান থিহ্যা রাখহরি। দে চে রাখহরি—' বা প্রধানের উন্মত্ততা প্রকাশের জন্যে নাট্য সংলাপ অদ্ভুত শব্দ সহযোগে গড়ে তোলেন, 'ঐ ব্যথা দৌড়ে পালিয়ে গেলচ একেবারে সে সোঁ-ও-ও-ও-ও-ও নদ-নদী, খালখজ্রূ পেরিয়ে বন বাদাড় ভেঙে সে ব্যথা একেবারে হাওয়া গাড়ির মতো দৌড়ে চলে গেল হুই—' আবার আবেগময় রূপকধর্মী সংলাপ রচনায় নাট্যকার সহজ সরল শব্দ ব্যবহার করেন নিপুণ হাতে,—'তাই ভালো। ভুলে যাও ব্যথার কথাঙ্গ ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভুলে যাও।'

শহুরে ভদ্র সম্প্রদায়ের ব্যশ্তি নির্মল বাবু। স্বশ্রেণীর ব্যশ্তি বর্গের অর্থগৃধ্নুতা এবং দুর্ভিক্ষের বাজারে অন্ধকার পথে কামানো অর্থে ঐশ্বর্যের দম্ভ প্রকাশের বিপক্ষে বিরুদ্ধ মানসিকতা পোষণ করে অর্থহীন মানুষদের পক্ষে সওয়াল করেন শহরাঞ্চলে ব্যবহৃত সহজ সরল সংলাপে, সে পয়সা যাদের আছে তার বলতে পারে এ কথাঙ্গ কিন্তু সমস্যা হ২েছ যে বেশির ভাগ লোকেরই আবার সেটা নেই কি-না?' এই দৃশ্যে 'মাগো মাগো' ধবনি দুর্ভিক্ষের হাহাকার প্রকাশের উপযুশ্ত সংলাপ। নাট্যকার এই শব্দ দুটির অভিনয় করিয়েছেন 'অফ ভয়েসে'। নেপথ্য থেকে মাইক্রোফোনে।

দেশী শব্দের সন্দ্বেগ আরবি ফার্সি ভাষার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নাট্যকার নাট্যসংলাপে বৈচিত্র্য এনে সংলাপকে শ্রুতিমধুর করে তুলেছেন যেমন, তেমনি ব্যশ্তি পরিচয়ের বাহন হয়ে উঠেছে এ সংলাপ। '............আর অগরারে ধরতেই পারলাম না কিছুতে। এই খপ করে ধরতে যাব কি সন্দ্বেগ সন্দ্বেগ উড়ে গিয়ে বেরুল বাদাড়েঙ্গ সামনে পেলাম, ধরে নিয়ে এলাম এডারেইঙ্গ এটু কমজোরি, তা হলেও কায়দা জানা আছে। প্যাঁচ মারা তো দ্যাখনি এরঙ্গ হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, অগরা পর্যন্ত কাছে ঘেঁসতে সাহস করে না এরঙ্গ

'নবান্ন' নাটকের সংলাপ গণনাটকের আসল সংলাপ। গণনাটকে গণচেতনা বৃদ্ধির একটা সচেষ্ট প্রয়াস থাকে। সেই চেষ্টাকে সফল করে তোলবার জন্য নাট্যকারকে সচেতন হতে হয়। নাটককে অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া সেই সচেতনতার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষের কাছে নাটককে নিয়ে যেতে গেলে, সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তুলতে গেলে সংলাপকে সর্বজনবোধ্য করে তুলতে গেলে সহজ সরল শব্দ, অতি প্রচলিত সাধারণ শব্দ দিয়ে সংলাপের দেহ গঠন করতে হয়। সেদিক থেকে 'নবান্ন' নাটক যথেষ্ট সফল বলা যেতে পারে।

'নবান্ন' নাটকের গান ছ

শিল্পকলা হিসেবে নাটকের উদ্ভবের সন্দ্বেগ গানের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কোনো দেশেই পূর্ণান্দ্বগ নাটক স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেনি। তার সূচনা কোনো ধর্মীয় বা লোকোৎসবের মধ্য দিয়ে

হয়েছে। এই সমস্ত উৎস বকালে গান-নির্ভ র আ বৃত্তির মধ্যে নাটক ও অভিনয়-কলা র জন্মসূত্র জড়িত। গ্রামীণ সৌ রোৎস ব থেকে যেমন যাত্রা র উদ্ভ ব ধ রা হয়, তেমনি এদেশে প্রাচীন নাটগীত, আধুনিক নাট্যকলা র অন্দ্বকু র বলে মনে ক রা হয়।

প্রাগাধুনিক বাঙলা র লোকজী বন প্রধানত যাত্রা প্রভা বিত ছিল। এই যাত্রাভিনয় ধর্মীয় বা লোকোৎস বকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হত। জনসাধা রণের রসপিপাসু মন এ র মধ্যেই প রিতৃ৫ি লাভ ক রত। এই ধ রনের রচনায় ধর্মভা ব ও সন্দ্বগীত বাহুল্য ছিল। এ দুটি র উপস্হিতিতে নাটকীয় দ্বন্দ্রে৩ র অভা ব লক্ষ্য ক রা যায়। এছাড়া যাত্রা লোকজী বনে র সন্দ্বেগ সম্পৃশু হওয়া র ফলে, মুশু মঞ্চে দৃশ্যপট ছাড়াই অভিনীত হত।

ঊনিশ শতকে বাংলা নাটক ইউরোপীয় আদর্শে গড়ে উঠলেও, বাঙালি জী বনে যাত্রা র সংস্কা র, স র্বত্র কাটিয়ে ওঠা সম্ভ বপ র হয়নি। বিশেষত মঞ্চমুখী নাট্যকারে রা যাদে র প্লে- রাইট বলে চিহ্নিত ক রা যায় তা রা জনচিত্তজয়ে র জন্য, তাদে র রুচি র রীতি র ওপ র অনেকটা নির্ভ রশীল হতেন। গান এ ক্ষেত্রে একটি অপ রিহার্য অন্দ্বগ গণ্য হয়। গানে র একটা তী ব্র আকর্ষণ আছে, মনো রঞ্জক ভূমিকা আছে। ঊনিশ শতকে র মঞ্চপ্রাণ নাট্যকারে রা অনেকেই গানে র বহুল ব্য বহা র করেছেন। কিন্তু নাট্যবোধ যেখানে প্রে রণা, জী বনে র গানে র ব্য বহা র নাট্য প্রয়োজনে র সন্দ্বেগ সম্পৃশু । নাটকীয় চ রিত্র ঘটনা ও প রিবেশ বর্ণনা, সংলাপ ও অভিনয়কে অর্থবহ ক র বা র জন্য বা ভা রাক্রান্ত দর্শকমনকে আনন্দ্র বি রতি ভ্র(Dramatic Relief). নীতি উপদেশ প্রভৃতি দে বা র জন্যও গানে র ব্য বহা র হয়ে থাকে।

কিন্তু ‘ন বান্ন’ গণনাট্য সংঘে র পতাকা নিয়ে এমন একটি সময় ও চেতনাকে প্রকাশ ক র বা র দায়িত্ব নিয়েছে, সেখানে প্রতিপাদ্য বিষয়টি মুখ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও জাপানী আক্র মণ, ৪২-এ র আন্দ্রোলনে উত্তাল এ দেশ, মা রী-মন্বন্ত র ও জলো২ছ৩াস, সন্দ্বেগ রাজনৈতিক ও সামাজিক দায় বদ্ধতা স্বভা বত নাট্যকারে র শিল্প বোধ ও সংযম গানে র বাহুল্যকে প রিহা র ক রতে সচেষ্ট হয়েছে। নাটকটি সমস্যাকণ্টকাকীর্ণ বৃহত্ত র জনসমাজ ও দেশে র নানা ঘটনা র সামগ্রিক রুপ ফুটিয়ে তোলায় এতই নি বেদিত যে, প্রথম তিনটি অন্দ্বেক র বা রটি দৃশ্যে সন্দ্বগীতে র ব্য বহারে র সুযোগই ছিলনা। যুদ্ধের জন্য গ্রামীন অর্থনীতিতে বিপর্যয়ে র জন্য সমাদ্দা র প রি বা র গ্রাম জী বন থেকে মন্বন্ত র ক বলিত শহরে আশ্রয় নিয়ে তা র সন্দ্বকট ও আ বর্তে বিব্রত ও হৃতস র্বস্ব হয়ে প রিশেষে ঘরে ফিরেছে। এ র প রই একটু স্হিত হ বা র অ বকাশ। বিজন ভট্টাচার্য কতকটা সমাদ্দা রদে র এই মানসিক স্বা২ছন্দ্র্য্য হৃদয়ে র উ২ছ৩াসকে ব্যঞ্জনাময় ক র বা র জন্য এ বং বোধকরি কতকটা দর্শক চিত্র রঞ্জনে র জন্য, চতুর্থ অন্দ্বেক র তিনটি দৃশ্যেই গান সংযোজন করেছেন।

প্রথম দৃশ্যে নি রঞ্জনে র গান ‘ বড় ্বালা বিষম ্বালা’ দ্বিতীয় দৃশ্যে জনৈক ফকিরে র গান ‘আপনি বাঁচলে বাপে র নাম’ এ বং তৃতীয় দৃশ্যে কৃষক রমণীদে র গান ‘নিস্‌লো চেয়ে সামনে র হাটে গলা র হাসলি।’

সুধী প্রধান লিখেছেন, মুদ্রিত সংস্ক রণে র ১৫ টি দৃশ্যে র প রি বর্তে মোট ১৪ দৃশ্যে নাটক অভিনীত হত। ফকিরে র গানটি মূল দৃশ্যকে প্রায় স ব বাদ দিয়ে চতুর্থ অন্দ্বেক র প্রথম দৃশ্যে কৃষকদে র সভাশেষে এ বং কুঞ্জ রাধিকা র ঘরে ফে রা র আগে গাওয়া হত। নি রঞ্জনে র গান ‘ বড় ্বালা বিষম ্বালা’— কোনদিনই গাওয়া

হয়নি। এমনকি শেষ দৃশ্যে কৃষক মহিলাদের গান দু'একদিন গাওয়া হলেও পরে পরিত্যক্ত হয়।

উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে এটি স্পষ্ট যে, অভিনয়কালে 'আপনি বাঁচলে' গানটি ছাড়া অন্য দুটি গানের নাট্যোপযোগিতা বস্তুত স্বীকৃত হয়নি।

গণনাট্য আন্দোলন তাঁর অন্যান্য প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শের উদ্বোধনে দায় বদ্ধ। নাটকের প্রথম অঙ্কত্রয়ে ঘটনার ঘনঘটায় এ বক্তব্যটি তুলে ধরা সম্ভবপর হয়নি। চতুর্থ অঙ্কের শান্ত স্নিগ্ধ শান্তির পরিবেশে ফকিরের গান হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত চাষী ঐক্য বদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছে। 'হিন্দু-মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান। ফকির বলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ভিন্ন আর উপায় নাই সার বুঝ সবে।' বহুদর্শী ফকির আকালের, মন্বন্তরের সীমাহীন দুর্দশার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেয়েছে—'বাঁচিবারে যদি চাও মনে আনো বল' এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে গাঁতায় খেটে আমন-ফসল ঘরে তোলবার পরামর্শ দিয়েছে।

এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে গাঁতায় খাটার এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে ধর্মগোলায় ফসল তোলার যে সঙ্কল্প ঘোষিত হয়েছে, তাকেই ফকির তার গানের মধ্য দিয়ে সকলের মনের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে। গানটি আপাতদৃষ্টিতে উপদেশাত্মক মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে গানটির ব্যবহার এখানে নাটকের যে লক্ষ্য—ঐক্য ও সংহতি এবং সমস্ত প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করা তারই ভূমিকা। এদিক থেকে এটি অনেকটা নাট্যোপযোগী।

নিরঞ্জন ও কৃষক রমণীদের গানদুটি সুখী গৃহস্থের জীবনের স্মৃতি-বিস্মৃতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি।

যুদ্ধ আন্দোলন মারী মন্বন্তরে বিধ্বস্ত গ্রাম আজ নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর, কিন্তু পুরনো দিনগুলো স্মৃতিকে ভারাতুর করে বইটিঙ্গ কিন্তু দুঃখের দহনজ্বালার মধ্য দিয়ে তো সুখের আসন প্রতিষ্ঠা এ কথাই তো বিজ্ঞজনেরা বলেন। নিরঞ্জন শুয়ে অবকাশ যাপনের সময় গানের মধ্য দিয়ে স্মৃতিবিজড়িত অতীত স্মরণের মধ্য দিয়ে একটি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছে, দেখা যায়। গানটি কথার সীমা অতিক্রম করে সুরের মধ্য দিয়ে তার স্বজন হারানোর বেদনাভারটিকে পাঠকের অনুভূতির গভীরে পৌঁছে দেয়। এর পরই কুঞ্জ রাধিকার প্রবেশ যেন—হারিয়ে পাওয়ার সুগভীর আনন্দে পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে।

কৃষক রমণীদের গান গ্রাম্য মেলার পরিবেশে উপস্থাপিত। মেলার রব, আনন্দ-উচ্ছ্বাসের স্বপ্ন রঙিন জীবনের আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। সঙ্কটকাটা বসানে জনমানসের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরবার পক্ষে গানটির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। মূল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মেলার আনন্দ-উচ্ছল পরিচয় তুলে ধরবার ক্ষেত্রে গানটি যথেষ্ট আনুকূল্য করেছে।

নাটকের গান তিনটির একটি মাত্র কার্যত অভিনয়কালে গীত হলেও, কোনটিই নাটকের ভাব রসের সঙ্গে সঙ্গতিহীন তো নয়ই বরং নাটকের অভিপ্রায়ের পরিপূরক।

৪৮.১৩ সারাংশ

নাটকে কাহিনীর পর চরিত্রের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাছাত্য বিশেষত গ্রীক নাটকে কাহিনীর প্রাধান্য ছিল, সেক্সপীয়রের নাটকে চরিত্রের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়। কিন্তু চল্লিশের দশকে গণনাট্য আন্দোলনের নাটকে ব্যক্তি নয়, সমষ্টির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। আর সামগ্রিক অভিনয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়। 'নবান্ন' নাটকে ছোট-বড় চরিত্রের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ। চরিত্রসংখ্যা থেকে বোঝা যায় যে নাটকের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতাই হয়তো এর জন্য দায়ী। একই সন্দেগ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের সন্দকট, আগস্টট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ-মহামারীর বিশাল ক্যানভাসে গ্রাম-শহরের বিপর্যস্ত চেহারা। এ সময় বিপর্যয় ঘটেছে মানুষের মূল্যবোধে, সমাজ ব্যবস্টথা ভেঙে পড়েছে, দেশে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত, এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্টথা নিতে গেলে বিস্তৃতের ক্ষেত্র ও চরিত্র সংখ্যা বৃদ্ধিঅপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এরা জনতার ভূমিকা নেয়নি। জনতায় অনেকগুলি মুখের সমাবেশ থাকে, অথচ তাদের চরিত্র এক ও অভিন্ন। এখানে তা ঘটেনি।

গুরুত্ব অনুসারে 'নবান্ন'-এর চরিত্রগুলো হল—প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ, রাধিকা, নিরঞ্জন, বিনোদিনী, পঞ্চাননী ও দয়াল এবং হারু দত্ত, কালীধন ধাড়া ও রাজীব। অন্যান্য চরিত্রগুলো নেহাৎই গৌণ— ক্ষণকালের জন্য এসে তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বটুকু পালন করেছে মাত্র।

প্রধান সমাদ্দার প্রথম দৃশেই দর্শকের সামনে উপস্টিথত হয়েছে। তখন থেকেই তাকে দ্বন্দ্বময়, মর্ম্মালায় জর্জরিত দেখা যায়। সূচনাতেই যখন দেখা যায় কুঞ্জ নিরঞ্জন আর পঞ্চাননী অবস্টথার প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় জ্ঞাপন করে— প্রথমোশু রা অসম শশ্তি বিন্যাসের কারণে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পালিয়ে যেতে বলে, পঞ্চাননী সেখানে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়। এই দুই স্বতন্ত্র মতের কারণে দ্বিধাগ্রস্ত প্রধান প্রতিরোধের কথা বলে — 'কুঞ্জ, ও কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ।.....আমি প্রাণ দেব। এর পেছনে সক্রিয় ছিল তার পুত্রশোক— শ্রীপতি ভূপতিকে পুলিশ-মিলিটারির আক্রমণে সে হারিয়েছে। এ যেন হত্যা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ। প্রধান ক্ষোভে বলেছে 'জন্তু জানোয়ারের মত বনে জন্দগলে পালিয়ে' বাঁচতে চায় না।

প্রধান দুটি সন্ত্রান হারাবার পর স্ত্রী পঞ্চাননীকে সম্বল করে বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে পারত, কিন্তু সে-ও পুলিশের নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। ওদিকে প্রকৃতি কেড়ে নিয়েছে তার সমস্তু সম্পদ। প্রলয়ন্দ্বকর ঝড়, সর্বনাশা বন্যা সন্দেগ নিয়ে এসেছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর। প্রধানের স্বপ্নের শেষ স্মৃতিটুকুও মুছে গেল। তাকেও পথে নামতে হল। বস্তুতপক্ষে নাটকে শারীরিক ও মানসিক আঘাত তার ওপরই বেশি করে নেমেছে। একের পর কে দুর্ঘটনায় প্রধান তার মস্তিষ্কের ভারসাম্য অনেকটা হারিয়ে ফেলে।

এই প্রধানকেই আবার যখন দেখি একদিকে হারু দত্ত, তার বাড়িতে এসে জমি কিনতে চায়, প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্রুদ্ধহারু গালাগাল দেয়, কুঞ্জ প্রতিবাদ করলে হারুর লাঠিয়ালারা কুঞ্জ ও প্রধানের মাথায় আঘাত করে। অপরদিকে প্রধানের চোখের সামনেই শশ্তি হীন মাখনের মৃত্যু হয়, তখন কিন্তু প্রধান কান্নায় ভেঙে না পরে

বলে, ‘মাখন চলে গেলি’— তখন বোঝা যায় এ বেদনার ভার বড় কঠিন, এর হাত থেকে নিস্তার নেই।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই প্রধান-ই এক সময় ছিল গ্রামের মাথা, নানা প্রতিকূলতায় পথের ভিখারি। তথাপি তার সম্বিত একেবারে হারায়নি। ফটোগ্রাফার তার বাড়ি জানতে চাইলে সে উত্তর দেয়, ‘.......এ-এ চিনতে পারবেনঙ্গ’ কন্দ্বকালসার দেহের ছবি তুলছে দেখে বলে, ‘তা ভালো,......... কন্দ্বকালের ছবির ব্যবসাঙ্গ ’— এ থেকে তার বোধের মধ্যে যে একটা আলো-আঁধারির পরিবর্তন কাজ করছে তা বোঝা যায়। অপর এক দৃশ্যে যখন দেখি এই প্রধান উৎসব বাড়িতে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সামান্য ভাত চেয়েও তা পা২েছ না, তখন ধিক্কার দিয়ে বলে, ‘তোমারা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু। ....অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবুঙ্গ’ তখন মনে হয় প্রধান সম্ভবত আবার বাস্তবে ফিরে এসেছে। আবার চিকিৎসা কেন্দ্রে ব্যথার কথা বলতে গিয়ে অনেক গিয়ে অনেক অসংলগ্ন কথা বলেছে, যা থেকে তাকে অনেকটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। নাটকের শেষে গ্রামে ফেরার পর মনে হয়, তার প্রায়ান্ধকার চৈতন্য, পরিচিত পরিবেশ হারিয়ে আবার ফিরে পায়। বলে, ‘ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো।’ দয়াল যখন বলে, ‘জোর প্রতিরোধ এবার,’ প্রধানও উ২ছ৩সিত আবেগে বলে উঠে ‘দয়াল’।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্টত এটি উপলব্ধির বিষয় যে, প্রকৃত অর্থে ‘নবান্নে’ কোনো নায়ক না থাকলেও প্রধান সমাদ্দারই এ নাটকের মুখ্য চরিত্র। মূলত তার সার্বিক জীবন যন্ত্রণা স্ত্রsufferings)....এ নাটকে প্রধানতম ঘটনা। সে এক সময় গ্রামে সম্পদে প্রতিষ্ঠায় মর্যাদায় শীর্ষস্থানে ছিল। ভাইপো, পাড়া প্রতিবেশী সকলেই তাকে মনত। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও সমাজ শোষণ তাকে সর্বতোভাবে রিশু করেছে। দুই ছেলেকে হারিয়ে, তিন মরাই ধান পুড়িয়ে, ক্ষুধা ও তৃস্তায় দুর্বল একমাত্র বংশধর মাখনকে হারিয়ে, অভাবের তাড়নায় জমি আংশিক বিক্রি করে, সে প্রায় সর্বস্ব খুইয়েছে। বাস্তু ছেড়ে শহরে গিয়ে ক্ষুধার অন্ন সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছে— এর চাইতে দুর্বিষহ জীবন যন্ত্রণা আর কি হতে পারে। সমাজের সংসারের মর্যাদার আসন থেকে এই চরম বিপর্যয় ও পতন, তার মত এমন তীব্র শোক, এ নাটকের কোনো চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এদিক থেকে প্রধান সমাদ্দার এ নাটকের অবিসংবাদী মুখ্য চরিত্রের মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী।

কুঞ্জ চরিত্রের মধ্যে তারুণ্যের তাজা রশু মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় একটা ভারসাম্য বজায় রেখেছে। সে বোঝে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী শাসকদের শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধেএগিয়ে যাওয়া মানে হঠকারিতা, অকারণ জান দিয়ে কোনো লাভ নেই। এই কুঞ্জই আবার হারু দত্তের চক্রান্তের শিকার প্রধান সমাদ্দারকে জমি বিক্রি করতে বাধা দিয়ে হারুর ক্রোধের কারণ হয়েছে।

কুঞ্জ কোনো দৈব নয়, আত্মশশি তে বিশ্বাসী। সে দেখেছে, মনুষ্যসৃষ্ট সন্ত্রাস, তারা প্রাণ নিয়েছে, মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। দেখেছে প্রকৃতির ভয়ন্ধকর রূপ, বন্যা মানুষের আশ্রয় এবং অন্ন কেড়ে নিয়ে তাদের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে ঠেলে দিয়েছে। তাই সে আর ভাগ্যঃভগবানে নয়, মানুষের নিজের ভেতর যে শশি রয়েছে, তার ওপর তার আস্থা সবচেয়ে বেশি।

কুঞ্জ গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার মূর্ত প্রতীক। স্ত্রী পুত্র, ভাই ও ভ্রাতৃবধূ ও জ্যেষ্ঠতাত নিয়ে তার চাষাড়ে

সাম্রাজ্য। এ সাম্রাজ্যের প্রধান সম্পদ জমি,ঃতার অপ্রতুলতা অভাব দূর করতে পারেনা। সৃষ্টি হয় মতানৈক্য। অনিবার্য হয় ছোটখাট ঝগড়া বিবাদ। এর ফলে সহধর্মিনীর সন্দেগ কদাচিৎ মতদ্বৈত হলেও পরিবারের অন্যদের জন্য স্নেহ মমতার অন্ত নেই। এই প্রীতিপূর্ণ বন্ধন স্পৃহা কুঞ্জ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

কুঞ্জ নিজের সংসারের ঝড়-ঝাপটা সামলায়, শুধু তাই নয়, প্রতিবেশীদের জন্যও তার হৃদয়ে দুর্বল স্থান আছে। নিজের পরিবারের জন্য ঘটি বাটি বিক্রি করে দুমুঠো চাল কিনে এনে যখন শোনে দয়ালের কুটোটির ব্যবস্থা নেই, তখন তার শেষ সম্বল থেকে খানিকটা দিয়ে তৃপ্তি বোধ করে। সে বুঝতে পারে গ্রামজীবনে একটি অনিবার্য সন্দকট নেমে আসছে, তাকে অবিচলিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর পাঁচজনের যা হবে, তারও তাই ঘটবে। সেই বাস্তব পরিস্থিতিতে গ্রামের মাটি থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে তারাও শহরের ফুটপাতে নেমে এসেছে। পশুর সন্দেগ খাদ্য কাড়াকাড়ি করে খেতে হলেও ক্ষতবিক্ষত কুঞ্জ হার মানেনি, জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা হয়নি, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পিছু হটেনি। বরং জীবনকে আরও গভীরভাবে আঁকড়ে ধরেছে, স্ত্রীর প্রতি মমতা, অজস্র ধারায় ঝরে পড়েছে। গভীর প্রেমে 'কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকেহ্ণ, তারপর হাতখানা তুলে দেয় রাধিকার মাথার ওপর। তৈরি হয় প্রেমের বিরল মুহূর্ত। তারা অবশেষে আমিনপুরে ফিরে আসে এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে সব ঠিক হয়ে যাবে এবং যায়-ও।

নিরঞ্জন অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র হলেও দুটি কারণে তার গুরুত্ব মানতে হবে। সে পরিবারের পাঁচজনের সন্দেগ দুঃখ ভাগ করে নিতে না পারলেও গ্রামের চোরা ব্যবসায়ী ও মেয়ে পাচারকারী হারু দত্ত এবং কালোবাজারী ও সেবাশ্রমের নামে নারীদেহের ব্যবসাদার কালীধন ধাড়াকে বামাল সমেত ধরিয়ে দেবার দুঃসাহস দেখিয়েছে। সে স্ত্রী বিনোদিনীকে কালীধনের সেবাশ্রমে ফিরে পেয়ে গ্রামে গিয়ে ভাঙা সংসার গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কুঞ্জ রাধিকা পুনরায় সেখানে গিয়ে আশ্বস্ত হয়েছে। প্রধান তার বিপন্ন চৈতন্যকে ফিরে পেয়েছে।

নবান্নের দুটি খলচরিত্র হারু দত্ত ও কালীধন ধাড়া। এরা মানুষেণ্ণ জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য নিয়ে কালোবাজারী মজুতদারী করে। নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এরা পারেনা এমন কোনো কাজ নেই। ধান-চালের মত নিজ গাঁয়ের মেয়ে পাচার করতেও এদের দ্বিধা হয়না। এই হারুই প্রধান সমাদ্দারকে টাকার লোভানি দিয়ে সস্তায় জমি কিনে নিতে চায়। বাধা পেলে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আক্রমণ করতেও তার বাধেনা। পাচারের জন্য মেয়ে কিনতে সে খুকির মা-র মত দালাল ধরে, সেই সন্দেগ নিজেও অক্টোপাসের মত মেয়ের বাপকে ঘিরেধরে কামড় বসায়। হারু দত্ত শঠ, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ধূর্ত ও জালিয়াত। হেন কাজ নেই যা সে পারেনা। নাট্যকার অত্যন্ত সতর্কভাবে চরিত্রটিকে গড়েছেন বলে সে হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

কালীধন সে তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বলভাবে চিত্রিত। তার অর্থ প্রাচুর্য ছিল, ছিল না দূরদর্শিতা। ভারত রক্ষা আইনের বিধান অমান্য করে প্রচুর চাল গুদামজাত করে রেখেছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেনি। ফলে নিরঞ্জন-বিনোদিনীর জালে জড়িয়ে পরে ভরাডুবি ঘটল। এদিক থেকে রাজীব স্বল্প পরিসরে কয়েকটি তুলির টানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সংলাপ উপকরণ ক্ষুরধার ব্যন্দগ, ক্ষুধার্ত মানুষ সম্পর্কে

তার মন্তব্য, 'দুর্ভিক্ষের কাঙালি যত সব বা 'দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় সব' তীব্র, তীক্ষ্ণ ও মর্মবিদারী।

নবান্নের স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে পঞ্চাননী, মাতঙ্গিনী হাজরার আদলে পরিকল্পিত। প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী সে। তার চারিত্রিক দৃঢ়তা মর্যদাবোধ উল্লেখযোগ্য। আগস্ট আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য শাসক শ্রেণির অত্যাচারের ভয়ে যখন সাধারণ গ্রামবাসী বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে তখন তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর থেকে শোনা যায়ঃ'তোদের এই অক্ষমতার জন্যে মেয়েমানুষ কেন সহ্য করতে যাবে এই দুর্ভোগ? .....সব চাইতে বড়ো কথা ই৭ ৎঙ্গঙ্গ' পুলিশের মার খেয়ে মানুষ যখন পালাচ্ছে, পঞ্চাননী তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেনঃএগিয়ে যা বলছি, এগিয়ে যা। পঞ্চাননী নিজেও এভাবে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছে।

বিনোদিনী সুসংগত, সংযত এক গ্রাম বধূর চরিত্র। সে পরিবারের সকলের সঙ্গে দুঃখ যন্ত্রণা ভাগ করে নিয়েছে। ঘটনাচক্রে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কালীধনের সেবাশ্রমে নিয়ে যায় এক টাউট। সেখানে আকস্মিকভাবে নিরঞ্জনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় দুষ্কৃতিরা ধরা পড়ে। নিরঞ্জন বিনোদিনীকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে, তারা আমিনপুরের বিধবস্ত সংসারকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।

রাধিকা এ নাটকের প্রধান স্ত্রী চরিত্র। কুঞ্জর স্ত্রী, সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ। একটি সন্তানের জননী। জ্যেষ্ঠ বধূ হিসেবে সকলকে নিয়ে চলবার মানসিকতা সম্পন্ন ও দায়িত্বশীলা গৃহবধূ। অভাবের সংসারে মাঝে মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও, দুঃখের সংসারকে সুখের করে তোলবার ঐকান্তিক আগ্রহের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যখন তারা ফুটপাথবাসিনী, ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহে বিপন্ন বোধ করেছে, তখনও তার অন্তরের প্রেম শুকিয়ে যায়নি, বরং এই দুর্দিনে তার স্বামী-প্রেম আরও অনেক গভীর হয়ে উঠেছে। স্তুদ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যৰ।

তার চৈতন্যের গভীর থেকে এ প্রেম নিঃসৃতঃতা তার কথা থেকে বোঝা যায়ঃ'খুব যন্ত্রনা হচ্ছে, নাঙ্গ জল এনে দেব, জল? একটু জল খাবে?'ঃএভাবেই নতুন করে তারা দুজনে দুজনের প্রেমের স্বাদ নতুন করে অনুভব করেছে। পরিশেষে, এই প্রেমই তাঁদের গ্রামে ফিরে নতুন করে ঘর বাঁধবার স্বপ্নকে উ৭ ীবিত করে। সে মুহূর্তে, তাঁর মৃত পুত্রের জন্য প্রাণ হাহাকার করে উঠলেও, তার সামলে নিয়ে এসে নতুন করে সব কিছু গড়বার আনন্দে মেতে ওঠে। নাটকের দর্শকযপাঠক প্রথম রাধিকাকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করে। রাধিকা 'নবান্ন' নাটকের একটি স্মরণীয় চরিত্র।

সংলাপ এক অর্থে নাটকের 'প্রাণ-ভোমরা'। সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার নাটকের বিষয়বস্তু বর্ণনা, নাটকীয় দ্বন্দ্বের উপস্থাপনা, নাটকের বৃত্ত গঠন, চরিত্র বিকাশ ও বিশ্লেষণ করে থাকেন। আবার এই সংলাপের মধ্যেই একাধারে নিহিত থাকে বাচিক অভিনয়ের উপকরণ, অপরদিকে অঙ্গাভিনয়ের অনেক অনুল্লেখিত নির্দেশ। সংলাপে ভাষা তাই নাটকীয় চরিত্রের ভাব, ভাবনা প্রকাশোক্ষম হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কালের ব্যবধানে বশু ব্যপস্থাপনা রীতিরও যুগে যুগে বিবর্তন ঘটেছে। প্রাক রবীন্দ্র, রবীন্দ্র-উত্তর, রবীন্দ্রযুগে নাটকের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি বদলেছে। চল্লিশের দশকে গণ-নাট্যের নাটকে সংলাপ এবং ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি বলা

যায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এ সময় সংলাপ হয়ে উঠেছে অনেকটা প্রত্যক্ষ জীবন থেকে উৎসারিতঃ রশু - মাংসে গড়া মানুষের জীবন্ত ভাষা। যেমনঃ

প্রধান। চল তো গাঙ বরাবর এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের, ডাক সব ওদের কুঞ্জ।

কুঞ্জ। না না না, তা হয় না, ... চলো পালাই।

প্রধান। পালাব, পালাতে বলছিস তুইঙ্গ

কুঞ্জ। আঃাঃহাঃা, তা খামখা জান দিয়ে কি কোনো লাভ আছে? স্ত্ব১য১ৰ

এই সংলাপ স্ব২ছঞ্জ, স্বাভাবিক, বাস্তু বধর্মী ও জীবন্ত। এর ভাষা মেদবিহীন, বহু বর্ণরঞ্জিত, মাটিঘেঁষা। আবারঃ

পঞ্চননী। আমিনপুরের কলন্দ্বক, আমিনপুরের কলন্দ্বক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস। পেছোসনি, এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।

নেপথ্যে বাঁশ ফাটার বিরামহীন শব্দ। পঞ্চননী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে স্তুক্ষীণকণ্ঠেৰ এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব....

পঞ্চননীর এই বাচিক ও আন্দ্বিগক সংলাপ চল্লিশের দশকে নবান্ন নাটকের মাধ্যমে মানুষের মনে প্রতিরোধের স্পৃহা সঞ্চার করে দেওয়া অগ্নিগর্ভ বাণী। এ সংলাপ নাট্যকারের সাধারণ সংলাপ নয়ঃপ্রতিবাদী চরিত্রের। এ চরিত্র নাট্যকার সৃষ্ঠ বলা ভুল হবে, বরং বলা ভালো আগস্ট আন্দ্রোলনের ঝঞ্ঝাবর্তে বিপ্লবী ভাবাদর্শে গড়ে ওঠা মানুষের। সেই সন্দেগ বলা যায়, দুর্যোগে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা মন্বন্তর মারীজনিত দুর্ভোগের প্রতিক্রিয়ায় ব্যতিব্যস্ত বিপন্ন মানুষ, পুলিশ প্রশাসন, চোরাকারবারীদের অত্যাচারে অসহায় গ্রামবাসী, সেই সন্দেগ যুদ্ধের আক্রমণে দিশেহারা জীবন্ত মানুষগুলির এ হল প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। আবার যখন শুনি 'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে, তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছেল্ল, ওতে আর ভয় করি নে।' স্তুকুঞ্জ ১য৫ৰ অথবা 'টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েচে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।' স্তুকুঞ্জ ১য৫ৰঃপ্রথমটিতে বশুার অদৃষ্টবাদ নয়, সুদৃঢ় বাস্তুববোধের পরিচয় যেমন ফুটেছে, তেমনি শেষোশু সংলাপে যেন উঠে এসেছে সত্যকথনের দৃঢ় প্রত্যয়ের অন্তস্টথল থেকে। এসব সংলাপের শব্দগুলো নাট্যকারের বানানো কথা নয়,গ্রাম বাংলার কৃষক মজুরের ঘরকন্না, মাঠঘাট, পথ-প্রান্তর থেকে উঠে আসা। শহুরে বিত্তমান মানুষের ভাষা থেকে এ সংলাপ একেবারেই স্বতন্ত্র।

তাই বলা যায় 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ গণজীবন থেকে পাওয়া যথার্থ অর্থে গণনাট্যের সংলাপ। গণনাটকের প্রধান উদ্দেশ্য যদি হয় নাটকের বিষয়বস্তু ও তার বশু ব্যকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া, তার সংলাপের ভাষাও সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'নবান্ন' এদিক থেকে যথেষ্ট সফল।

নাটকে গানের ব্যবহার নানা কারণে হয়ে থাকে। অনেকে মনে করেন, যাত্রা নাটগীতের সন্দেগ বাংলা

নাটকের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায়, নাটকের গঠনের ব্যবহার জন্মসূত্রেই এসে গেছে। তাই গানের এক২ছত্র আধিপত্য বাংলা নাটকে বাস্তব ঘটনা নয়। কিন্তু যেহেতু প্রাগাধুনিক বাঙলার লোকজীবন যাত্রা প্রভাবিত ছিল, তাই জনজীবনে, সেই সূত্রে সংগীতের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপীয় আদর্শে বাংলা নাটক রচনার আগ্রহ দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটক ও বাঙালির যাত্রার সংস্কার সর্বত্র কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। ফলে গান এক্ষেত্রে অপরিহার্য গণ্য হয়েছে। নাটক, বস্তুত জীবনাশ্রয়ী, বাস্তব জীবনের কথা বলা, তার প্রধান দায় হলেও, এই জীবনে বিনোদনের একটি ভূমিকা আছে, আছে, তাই সন্দ্বগীতঃকণ্ঠ ও বাদ্যযুশু হওয়া অসন্দ্বগত নয়। কিন্তু সন্দ্বগীত যদি নাট্য বিষয়কে আ২ছন্ন করে, তবে নাটকের মৌল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। ব্যবসায়িক থিয়েটারের নাটকে নাচ-গানের বাহুল্য অনেক ক্ষেত্রেই পীড়াদায়ক। নাচগান এখানে পণ্য। দর্শক মনোরঞ্জনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সাফল্য তার প্রধান লক্ষ্য। গ্রিক নাটক বা সেক্সপীয়রের নাটকেও গানের ব্যবহার আছে। গান সেখানে নাট্যবোধ সঞ্চারে যেমন সহায়ক, তেমনি ঘাত-প্রতিঘাত দ্বন্দ্ব৩মুখ্য নাটকে বিশেষ ভাব-রস সঞ্চারের প্রয়োজনে, কখনও কখনও গানের ব্যবহার করা হয়েছে। গানের ব্যবহার এ ক্ষেত্রে নাট্য প্রয়োজনের সন্দ্বেগ সম্পৃশু ।

'নবান্ন' গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে একটি সময় ও চেতনাকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব পালন করেছে। সেখানে গান মুখ্য বিষয় নয়ঃমুখ্য তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই বিশ্বযুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, ঝড়-জলো২ছতাস, মারী, মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এ নাটকের প্রেরণা, সেখানে মনোরঞ্জক গান প্রধান বিষয় হতে পারেনা। তাই পনের দৃশ্যের নাটকের প্রথম বারোটি দৃশ্যে গানের ব্যবহার নেই। এ নাটকে যে তিনটি গান রয়েছেঃতাও নাটকের শেষে চতুর্থ অন্দ্বেকর সমস্যাজর্জরিত মানুষ নতুন ফসল চোখের সামনে দেখে স্বস্তি ও আনন্ধের আশ্বাস নিয়ে যখন শহর থেকে একে একে ঘরে ফিরছে, তখন তাদের কণ্ঠে গান উঠে এসেছে। প্রথম দৃশ্যেই ঘরে ফিরে নিরঞ্জন 'ঘরখানা জুড়েতেড়ে' নিয়ে গ্রামের সকলের সন্দ্বেগ আলাপচারিতার পর দাওয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে গান ধরেছেঃ'বড়ো॒লা বিষম ॒লায় পুড়ে হব সোনা'। জ্ঝ৪য১ৰ দ্বিতীয় দৃশ্যে জনৈক পথিকের গানঃ'আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম মিথ্যা সে বয়ানযহিন্দ্রু মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান।' ধর্ম ও সম্প্রীতির গান গণনাট্যের বশু ব্যকেই তুলে ধরেছে। তৃতীয় দৃশ্যে 'নবান্ন' উৎসবের মাতোয়ারা কৃষক রমণীর গানঃ'নিসলো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাঁসুলি।' প্রভৃতি বিষয়ানুগ ও সবিশেষ তাৎপর্যবহ।

৪৮.১৪ অনুশীলনী ৩

১। **সঠিক উত্তরে জ্ঝ▤ৰ টিক চিহ্ন দিন :**

জ্ঝকৰ 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র সংখ্যা ঃ ১০য১৮য২৪য৪৫

জ্ঝখৰ 'নবান্ন' নাটকের মুখ্য পুরুষ চরিত্র ঃ কুঞ্জযপ্রধানযনিরঞ্জন।

জ্ঝগৰ 'নবান্ন' নাটকের মুখ্য নারী চরিত্র ঃ পঞ্চাননীযবিনোদনীযরাধিকা।

২। **নিচে উল্লিখিত চরিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন :**

রাজীব, দয়াল, মণ্ডল, নির্মলবাবু, বরকত, যুধিষ্ঠির।

৩। ''তাও বেঁচে থাক বাবা ব্ল্যাক মার্কেট, বেঁচে থাক আমার মজুতদার, না হয় চতুর্গুণই পয়সা নেবে, জিনিসটি তো ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে।'' ঃবক্তা কে? ব্ল্যাক মার্কেট কী? 'মজুতদার' শব্দটির উৎস কী? কোনো প্রসঙ্গে বক্তা একথা বলেছেন? বক্তার সম্পর্কে আপনার অনুভব সংক্ষেপে লিখুন।

৪। 'নবান্ন' নাটকের নায়ক কে যুক্তি সহ আলোচনা করুন।

৫। ''চলে এয়েছে বলেই যে জিনিসটারে চালিয়ে নেবে, ভালমন্দ্র বিচার পর্যন্ত করবে না, কী রকম ধারা কথা।'' ঃবক্তা কে? কী 'চলে এয়েছে'? বক্তার মনোভাবটি বুঝিয়ে দিন।

৬। 'নবান্ন' নাটকে প্রধান সমাদ্দার যহারু দত্তের নাট্যভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭। চরিত্র ও পরিবেশ উপযোগী সংলাপ রচনায় নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য অনেকটাই সার্থক। 'নবান্ন' নাটক অবলম্বনে মন্তব্য বিচার করুন।

৮। 'নবান্ন' নাটকের সংলাপের বিশিষ্টতা ও স্বাভাবিকতা উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

৯। 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ 'অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক'ঃএ মন্তব্যের যাথার্থ বিচার করুন।

১০। 'নবান্ন' নাটকের সন্দ্বগীতসমূহের নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১১। ''এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না। চল ফিরে যাই।''ঃবক্তা কে? কোথায় ফিরে যাওয়ার কথা বলেছে? 'পোড়া মাটির দেশ' বলতে কি বুঝিয়েছেন? এ কথা বলায় বক্তার কী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়?

১২। ''তাই ভালো। ভুলে যাও। ভুলে যাও ব্যথার কথাঙ্গ ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভুলে যাও।'' ঃএই সংলাপ কার? নাটকীয় তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

১৩। ''ওরে বাবারেঃতা দিতে হবে না। মানুষের মুখের কথায় জানবে চন্দ্রর কোনো মূল্য নেই, একেবারে কিছু দাম নাইঃকথা এই বললে, ফুরিয়ে গেলঙ্গ না কিঙ্গ করবে যা তা সব কাগজে কলমে। একবার করলে চিরকালের মতো এট্টা ইয়ে হয়ে থাকলঙ্গ'' ঃকার লেখা, কোন নাটকে, কার উক্তি ? প্রসন্দ্বগটি উল্লেখ করুন। উক্তিটির মধ্যে বক্তার কি চরিত্র-পরিচয় মেলে বুঝিয়ে দিন।

৪৮.১৫ 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চ, আলো, আবহসংগীত ও অন্যান্য নেপথ্য বিধান

মঞ্চ :

এদেশে আধুনিক মঞ্চ বলতে যেটি বোঝায় তা প্রসেনিয়াম মঞ্চ। তার নির্মাণকর্তা লেবেডফ। সেখানে তিনি যে বাংলা নাটকটির অভিনয় করান তার নাম 'কাল্পনিক সংবদল'। এটি এম. জড্রেল-এর লঘু নাটক

'দি ডিগসাইস্'-এর বন্দগানুবাদ। তার মঞ্চগঠন পদ্ধতি দেখে আমরা মঞ্চের একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারি। তা হলঃতিনদিক ঢাকা সম্মুখ ভাগ খোলা একটি আয়তাকার ক্ষেত্রবিশিষ্ট স্থান যার ওপরটাও ঢাকা এবং মাঝখানটি উঁচু বেদির মতোঃতাকে মঞ্চ বলা হয়। এই উঁচু মঞ্চটিকে অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাজান হয়। লেবেডফ অভিনয়ে চারুত্ব সম্পাদনের জন্য মঞ্চকলার অভিনবত্ব সৃষ্টিতে আগ্রহী ছিলেন। একাজে তিনি ছিলেন একাধারে স্থপতি, কারুশিল্পী, দৃশপট শিল্পী, সন্দগীত ও অভিনয় পরিচালক। এক্ষেত্রে তাঁর স্বদেশের মঞ্চপরিকল্পনা ও মঞ্চশিল্পী ফিয়োডার ভলকভের সম্ভাব্য অনুসরণ ছিল মনে হয়। তথাপি তাঁর দৃশ্যান্দ্বকনে বাংলাদেশ ও বাঙালির প্রতিকৃতি প্রাধান্য পেয়েছিল। এর পর বাংলা নাট্যমঞ্চের দৃশ্যস৭ায় পরিবর্তন আনেন ধর্মদাস সুর। ধর্মদাস ১৮৭২ সালে ৭ই ডিসেম্বরে অভিনীত 'নীলদর্পণ' নাটকের মঞ্চস৭ার হাতেখড়ি দিয়েছিলেন. এই মঞ্চের পিছনে ছিল কাপড়ের ওপর হাতে আঁকা দৃশ্যপট। এই দৃশ্যপট বা সীনগুলো ওপর থেকে পর পর ঝোলান থাকত। দৃশ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী তোলা নামানো হত সেগুলো। তারপর এই আঁকা সীনগুলির সন্দেগ দুপাশে টরমেন্টার এঁকে তার মধ্যে একটু ডাইমেনসন আনার চেষ্টা হয়েছিল। ক্রমে ওই সব কাপড়ে আঁকা স্থির চিত্রগুলির সন্দেগ সন্দগতি রেখে কিছু কিছু আসবাব ব্যবহার করা হত। এরপর ওই স্থির দৃশ্যপটের সন্দেগ যুশু করা হল ফ্ল্যাটসীন। কাঠের ফ্রেমের ওপর টান করে কাপড় লাগিয়ে তার ওপর ছবি আঁকা হত। এর সন্দেগ দুটো ফ্রেম তৈরি করা হত। দুদিক থেকে ঠেলে জুড়ে দিলে একটা দৃশ্যপট হয়ে যেত। একেই বলা হত ঠেলা সীন। আবার দৃশ্য শেষ হয়ে গেলে দুপাশে টেনে নিয়ে যাওয়া হত।

এই অবস্থাকে মেনে নিয়ে মঞ্চেএলো প্যানোরামা পদ্ধতি। কিন্তু ১৮৯৭ সালের আগে নতুন কোনো পদ্ধতি মঞ্চস৭ার ক্ষেত্রে দেখা গেলনা। ১৮৯৭ সালে অমর দত্ত রন্দগমঞ্চেএক বিস্ময়কর পরিবর্তন আনলেন। ক্লাসিক থিয়েটারে তাঁর প্রথম প্রযোজনা 'নলদময়ন্তী'। 'নলদময়ন্তী' নাটকের বিজ্ঞাপনের একটুখানি তুলে দিলে আমাদের বশু ব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে।

''নলদময়ন্তীঃSplendid Lotus Scene!

একটি ক্ষুদ্র পদ্মকোরক হইতে দলে দলে অপ্সরীগণ বহির্গত হইয়া পদ্মে পদ্মে দাঁড়াইয়া নৃত্যগীত করিবে।''

এই ক্লাসিক থিয়েটারের আমল থেকে দৃশ্য স৭ায় কাট আউটের ব্যবহার। সেট সীন, নকল আসবাবপত্রের পরিবর্তে আসল বস্তু দৃশ্যস৭ায় এসে গেল। যেমন, আসল খাট, আয়না, চেয়াল-টেবিল ইত্যাদি।

মঞ্চএবং মঞ্চপরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তন ঘটালেন শিশির ভাদুড়ী। তিনি নাট্যমঞ্চেদুটি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটালেন। জ্ব১ৰ পাদপ্রদীপ বা ফুটলাইট তুলে দিলেন। জ্ব২ৰ উইংস বা পার্শ্বপট নামক কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক প্রবেশ প্রস্থানের পথকে রন্দগমঞ্চথেকে চিরকালের জন্য নির্বাসন দিলেন। প্রথমটি সম্পর্কে আমরা নেপথ্যবিধানের অন্যতম অন্দগ, আলোকসম্পাতের প্রসন্দেগ আলোচনা করব। এখন উইংস বা পার্শ্বপট প্রসন্দেগ আলোচনা করা যাক।

কলকাতায় ইংরেজদের নাট্যাভিনয়ে ব্যবহৃত মঞ্চের অনুসরণে বাংলা রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট হিসেবে অঙ্কিত পশ্চাৎপট ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। প্রসেনিয়াম মঞ্চে তখন থেকেই উইংসের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। উইংস মঞ্চের দুপাশে থাকত। দুটি উইংস বা পার্শ্বপটের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে শিল্পীরা মঞ্চে আসত এবং প্রস্থান করত। এই ব্যবস্থা যখন দৃশ্য সংস্থাপনায় কাট-আউট দৃশ্য সংবলিত সেট সীনের ব্যবহার চালু হল তখনও প্রচলিত ছিল। কিন্তু শিশির কুমার ভাদুড়ী দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ বিশিষ্ট ডাইমেনসনাল বা মাত্রাবিশিষ্ট মঞ্চের প্রবর্তন করার সন্দেগ সন্দেগ পার্শ্বপটের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করলেন। তার ফল মঞ্চে শিল্পী পেলেন প্রবেশ প্রস্থানের স্বাভাবিক পথ। মঞ্চ হয়ে উঠল আরো বাস্তব এবং জীবন্ত। বাস্তব এবং জীবন্ত বলা হয়েছে এই কারণে যে, একটি ঘর দেখান হয়েছে মঞ্চে নিছয় তার দরজা থাকবে। একটা বাইরের, আর একটা ভেতরে যাওয়ার। শিল্পীরা ডাইমেনশনাল মঞ্চ পেয়ে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমনের স্বাভাবিক পথ ব্যবহার করার ফলে মঞ্চ অনেক বেশি বাস্তব ঘেঁষা হয়ে উঠল। এছাড়া শিশির ভাদুড়ী মঞ্চে খোলা আকাশ দেখাবার ব্যবস্থাও করেছিলেন, তবে অত্যন্ত জটিল পদ্ধতিতে।

শিশির কুমার ভাদুড়ী ডাইমেনশনাল মঞ্চ তৈরি করে মঞ্চস্থাপত্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। তার পূর্ববর্তীকালে প্রচলিত প্রসেনিয়াম মঞ্চকে সাধারণত ফ্লাট মঞ্চ বা সমতল মঞ্চ বলা হয়ে থাকে। এই সমতল চতুষ্কোণ বিশিষ্ট মঞ্চকে একমাত্রিক মঞ্চও বলে যেতে পারে। এই একমাত্রিক বা One dimensional মঞ্চকে দ্বি-মাত্রিক (two dimensional) বা ত্রি-মাত্রিক (three dimensional) মঞ্চ করা যায়। একসন্দেগ যেখানে দুধরনের বা তিন ধরনের অভিনয় দেখাবার প্রয়োজন সেখানে এই রকম মঞ্চ একান্ত অপরিহার্য। 'নবান্ন' নাটকের দ্বিতীয় অন্দেকর তৃতীয় দৃশ্যের যে মঞ্চপরিকল্পনার নির্দেশ নাট্যকার দিয়েছেন তা দ্বিমাত্রিক মঞ্চ বা two dimensional মঞ্চ পরিকল্পনার ইন্দ্বিগত দেয়ঃ

> শহরের রাজপথ। পাশেই এক ধনীর আবাসভবন। সামনের ফটক দিয়ে যাচ্ছে সুবেশ পুরুষ ও মহিলারা ঢুকছেন বেরুচ্ছেন। ফটকের ভেতরে ঢুকতে ডাইনে বাঁয়ে সার বন্ধ্রী ভেনেস্তা কাঠের চেয়ারগুলোর গা বেয়ে যেন বিজলি বাতির আলো চুঁইয়ে পড়ছে। অন্ধ্র রমহল থেকে সানাই-এর সুর কেঁদে কেঁদে উঠছেঃ আশাবরীর আলাপ চলেছে বিলম্বিত তানে। হাসির লহরী তুলে কলহাস্যমুখর একদল তরুণী যেন এক ঝাঁক প্রজাপতির মতোই উড়ে বেরিয়ে গেল ফটকের ভেতর দিয়ে। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সপারিষদ বাড়ির বড়োকর্তা। অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করেছেন এই যে আসুনঃ বসুন।' তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে দশ বারো বৎসরের একটি ফুটফুটে মেয়ে, হাতে তার এককাঁড়ি বেলকুঁড়ির মালা। এই গেল মঞ্চের ডানদিকের ব্যাপার। আর মঞ্চের বাঁ দিকের এক কোণে অর্ধবৃত্তাকারে দেখা যাচ্ছে একটা ডাস্টবিনঃ অস্পষ্ট। কুঞ্জ ও রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট কলাপাতার স্তূপ ঘেঁটে আহার্য সন্ধান করছে। কিন্তু আলোর অস্পষ্টতার দরুণ ওদের কাউকেই ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছে না।

এই নির্দেশ থেকে two dimensional মঞ্চস্থাপত্যের ইন্দ্বিগত বেরিয়ে আসে। শিশির কুমার ভাদুড়ী 'সীতা' নাটকে প্রথম মঞ্চস্থাপত্যে এই ধরনের নতুনত্ব সৃজন করেছিলেন। 'সীতা' নাটকের একটি দৃশ্যে

দেখাতেন, প্রাসাদ অন্দ্বগনে উঁচু স্থানে প্রধান প্রধান ব্যক্তি রা, নিম্নস্থানে জনসাধা রণ, সকলে র ওপরে অলিন্দ্রে উপস্থিত অন্তঃপু রচা রিণী রা, কেউ উপবিষ্ট, কেউ দণ্ডায়মান, কেউ চলমান এ বং সকলেই অভিনয়ে রত। কেউ হাবেভাবে, কেউ ভাষায়। স্পষ্টত, ত্রিমাত্রিক মঞ্চ ব্য বস্থা র ইন্দ্বিগত এখানে পাওয়া যা২েছ।

শিশি রকুমা র ভাদুড়ী র 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে র একটি মঞ্চপ রিকল্পনা এখানে তুলে দেওয়া হল। এই নাটক টি সামগ্রিক প্রয়োগ কুশলতায় বন্দ্বগ রন্দ্বগমঞ্চেঅতুলন। প্রথমে যে তাঁ বু র দৃশ্য দেখান হয়েছে তা প্রেক্ষাগৃহকে সচকিত করে তোলে। পু রো মঞ্চপীঠে র আয়তন জোড়া একটি কাঠে র ফ্রেমে দ র বা র, তাঁ বু র অনুক রণে ছাপানো কাপড় হুক দিয়ে ঝুলিয়ে অভ্যন্ত রভাগ তৈরি ক রা হয়েছিল। পেছনে প্রবেশপথ এ বং তা র দুধারে দ্ধদর্শনানুপাতৰ অনুযায়ী অন্যান্য তাঁ বু র অংশ তৈরি ক রা হয়েছিল। তাঁ বু র পিছনে মোতায়েন রক্ষী বাহিনী টহল দি২েছ। কিং বা, দিল্লী র রাজপথ পিছনে রেখে জুম্মা মসজিদে র চত্বরে র দৃশ্যঃ যেখানে সামনে পিছনে অস্থি র পদচা রণা ক রতে ক রতে নাদি র শাহ দিল্লী ধবংস করেছিলেন। 'কোতল' 'কোতল' বজ্রনিনাদ আ র জনতা র আর্তকোলাহলে র সন্দ্বেগ দিল্লী র অগ্নিদগ্ধ হওয়া র দৃশ্য অবিস্ম রণীয়। শ্রীশম্ভু মিত্র বলেছেন, 'দিগ্বিজয়ী' না দেখলে, তিনি 'ন বান্ন' নাটকে র প্রথম দৃশ্য কল্পনা ক রতে পা রতেন না। এই প্রসন্দ্বেগ 'ন বান্ন' নাটকে র প্রথম দৃশ্যে র মঞ্চ ব্য বস্থায় নাট্যকারে র নির্দেশটুকু তুলে দেওয়া হলঃ

> দিনা বসানে চ রাচ র আ২ছন্ন করে দুর্গত পল্লী র বুকে নেমে আসছে রাত্রি। মঞ্চপ্রায়ান্ধকা র। সুদূরে র পটভূমি রক্তি ম। অস্পষ্ট আলোকে ক২ছপে র পিঠে র খোলা র আকৃতি একটা মালভূমি র ওপ র ছায়ামূর্তি র মতো দু-চা রজন লোকে র আনাগোনা লক্ষ্য ক রা যা২েছ। এই দুটো লোক ত্রস্ত অথচ সন্তর্পণে ঢুকে কী যেন স ব ফিসফিসিয়ে বলা বলি ক রল নিজেদে র মধ্যে আ বা র বেরিয়ে চলে গেল। একটু পরেই আ বা র এসে ঢুকল যেন আ রও কা রা। কী স ব কথা ফিসফিস করে বলে কয়ে চলে গেল। ছায়ামুর্তিগুলো র হাত-পা নাড়া ও কথা বলা র বলিষ্ঠ ধ রনে মনে হ২েছ যেন কী একটা ভীষণ চক্রান্ত চলছে ওদে র মধ্যে। হঠাৎ নতুন কোনো কিছু র আহুতি পেয়ে পটভূমিটা আ রও রক্তি ম হয়ে উঠলহু, আ র ঊর্ধ্বগতি ধূমকুণ্ডলী র সন্দ্বেগ উড়তে লাগল ছাই আ র আগুনে র ফুলকি। আগুনে র আভায় মালভূমি র ওপ রকা র দুটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি এ বা র সুস্পষ্ট হয়ে উঠল দুচোখে র সামনে। কালো চেহা রা র বলিষ্ঠ দুজন লোক। একজন প্রৌঢ়ত্বে র ওপারে পৌঁছেছে : আ র একজনে র বয়স কমঃগোটা ত্রিশ- বত্রিশ। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গোটানো, হাতে গাছলাঠিঃশ রী রে র সমস্ত পেশীগুলো ফুলে উঠেছে উত্তেজনায়।

উপ রোক্ত বিব রণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় শ্রীশম্ভু মিত্র যথার্থ কথা বলেছেন :

শিশি রকুমা র ভাদুড়ী র 'সীতা' এ বং 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে মঞ্চের ওপ র যে স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তা আরো বাস্ত ব আরো সহজ হয়ে এলো ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৩ সালে রন্দ্বগমহলে 'মহানিশা' নাটকে সতু সেন প্রথম রিভলভিং বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চতৈরি করে বক্স-সেটে র ব্য বহা র ক রলেন।

এ রপ র মঞ্চ ব্য বস্থা র রীতি আরো সহজ ও স রল হয়ে এলো ১৯৪৪ সালে গণনাট্য সংঘে র 'ন বান্ন' নাটক প্রয়োজনায়। মঞ্চের ওপ র কে বল মাত্র গোটাচারেক চট ঝুলিয়ে দিয়ে তাকেই দৃশ্যানুযায়ী একটু আধটু

পরিবর্তন করে ঘর বার দুই দেখান হয়েছিল।

প্রসেনিয়াম দর্শক ও নাট্যাভিনয় ক্ষেত্রে অভিনয়কারী কুশীলবের মধ্যেকার একটা অস্বাভাবিক অবরোধ। সুতরাং এই অবরোধ উঠে গেলে নাটক ও দর্শক এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের স্তরে এসে পৌঁছতে পারবে। এই ব্যবস্থাকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। তবে এই কাজে আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা।

গণনাট্যের যুগে নাট্যকর্মীদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নাটককে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ অত্যাচার নিপীড়ন বঞ্চনার কাহিনী জনসমক্ষে তুলে ধরা এবং যারা তাদের দুঃখ, বেদনা, বঞ্চনার কারণ তাদের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানান অর্থাৎ প্রতিবাদের নাটক বা Drama of Protest গড়ে তোলবার ইচ্ছা। শহরাঞ্চলের স্থায়ি রঙ্গমঞ্চের বাইরে উন্মুক্ত আকাশের তলে, মুক্ত অঙ্গনে নাটককে নিয়ে যেতে হবে। তা করতে গেলে আয়োজন বহুল মঞ্চকে হালকা করে ফেলতে হবে। সেই সঙ্গে সমস্ত কিছুকেই সহজ সরলীকরণ করে নিতে হবে। সহজ ও সরলীকৃত হওয়ার প্রবণতা যে রঙ্গমঞ্চের মধ্যে নিহিত আছে, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী তা বুঝেছিলেন, তাই তিনি নাট্যমঞ্চনিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে গেছেন। শিশির ভাদুড়ী যে দৃষ্টিভঙ্গিটির আভাস রেখে গিয়েছিলেন, গণনাট্য সংঘের কর্মীরা সেই ইঙ্গিতটুকু অবলম্বন করে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট হলেন। গণনাট্যের নাট্যকর্মীরা চল্লিশের দশকে পেশাদারী নাট্যমঞ্চের বাইরে নাটককে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রহণ করেছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। তার জন্য রঙ্গমঞ্চের প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভেঙে সহজ সরল করে নেওয়ার জন্য ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা সুরু করেছিলেন।

গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চপরিকল্পনার রীতিতেই পরবর্তীকালে বাংলা রঙ্গমঞ্চে এসেছে 'সাজেসটিভ' মঞ্চ। 'নবান্ন'র হাত ধরে সাজেসটিভ রিয়ালিজমের হাওয়া বাঙলা রঙ্গমঞ্চে এসে বাঙলার পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলিকে নাজেহাল করে তোলবার চেষ্টা চালিয়েছে। আর তার জন্যই মঞ্চ ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে শহরে, গ্রামে যত্রতত্র। এই রীতিতে শুধুমাত্র একটা কালো পর্দার সামনে গুটিকয়েক আসবাব দিয়ে কিংবা তার বদলে কাঠের বাক্স সাজিয়ে সাজেসটিভ সেটে নানা পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। তার ফলে নাটকের সন্দেগ মানুষের ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে, নাটক হয়ে উঠছে মানুষের জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার। একাজে অবশ্য আর একটা নেপথ্য বিধান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার নাম আলোকপাত। পরে সেই আলোকসম্পাতের বিবর্তনের চেহারাটা সুস্পষ্ট করে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে।

মঞ্চআলোকসম্পাতঃআবহসংগীত :

এখন মঞ্চেআলোকসম্পাত ধ্বনি এবং আবহসংগীত প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ের বিশিষ্ট অঙ্গগুলির যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। 'নবান্ন' নাটকের ক্ষেত্রেও এগুলির ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণার প্রয়োজন আছে। আধুনিক বিচারে এগুলিও নাট্যাভিনয়ের সন্দেগ গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। নাটককে মনোজ্ঞ করে তুলতে, নাটককে রসগ্রাহী করে তুলতে গেলে এদের ভূমিকা অপরিসীম। রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে পছাৎপটে যে আর এক ধরনের অভিনয়, অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সমান্তরালভাবে চললে নাট্যাভিনয় একটি নিটোল রসরূপ

পায়, তার একান্ত ঘনিষ্ঠ অন্দগ হল ঐগুলি। 'নবান্ন' নাটককে নিটোলত্ব দান করেছে মঞ্চব্য বস্টথা, আলোকসম্পাতের নতুনত্ব এবং আবহসংহীতের অভিনব আয়োজন। অতএব এ সম্পর্কে কিছু জানার দরকার আছে।

নেপথ্যবিধান ও 'নবান্ন' নাটক :

নাট্যাভিনয় বা থিয়েটারের দুটি অংশ : জ্ব১ব প্রত্যক্ষ অভিনয়, জ্ব২ব নেপথ্য অভিনয়। নট-নটী অভিনেতা অভিনেত্রীদের সংলাপ ও অন্দগভন্দিগ সহযোগে অভিনয় মঞ্চেঘটতে থাকে। আর এই অভিনয়কে মনোজ্ঞ, বা০য় ব্যঞ্জনাধর্মী এবং অভিনয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলবার জন্য নেপথ্য অভিনয়ের অপরিহার্যতা সর্বজনস্বীকৃত। এই দ্বিতীয় অভিনয় বা নেপথ্য অভিনয়কে নেপথ্যবিধান বলে। নেপথ্যবিধান অভিনয়ের সন্দেগ একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সন্দগতিসম্পন্ন এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। উভয়ে সুসন্দগত সহযোগিতায় নাটকে বাঞ্ছিত রস সৃষ্টি হয়। 'নবান্ন' নাটক শুধু কাহিনীগত গতানুগতিকতার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়নি, মঞ্চস৭ায়, আবহসংহীতে এবং আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনয়ন করেছিল, যা গণনাট্য সংঘের এক লক্ষণীয় প্রচেষ্টা। পেশাদার মঞ্চপরিকল্পনার বাইরে নাটককে গণনাট্যকে রূপান্তরিত করে যে পরিবর্তন সূচিত করেছিল, আজও সেই প্রবাহে পরবর্তী নাট্য আন্ড্রোলন প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

আলোকসম্পাত ও 'নবান্ন' :

ভারতবর্ষ, কি ভারতবর্ষের বাইরে যে সমস্ত নাট্যাভিনয় প্রাচীনকালে করা হত তা বস্তুত হত দিনমানে। তখন মঞ্চেআলোকের উৎস ছিল সূর্য। উন্মুশু আকাশের তলে তখন অভিনয়পর্ব চলত, সূর্য নামক একটি আলোক উৎসের অজস্র রশ্মিপুঞ্জ রন্দ্বগমঞ্চেঅপর্যা৫ আলোসরবরাহ করত। কিন্তু নাট্যাভিনয় যে দিন থেকে উন্মুশু আকাশ পরিত্যাগ করে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে এসে পড়ল, সেদিন থেকে স্বাভাবিক আলোক উৎস থেকে রশ্মিসরবরাহ ব্যবস্টথায় বাধা পড়ল। তখন থেকেই আলোর অস্বাভাবিক প্রয়োগকৌশলে নাট্যমঞ্চযেন কথা বলে উঠল, এক নতুনতর প্রাণবন্ত অভিব্যশ্তিতে চনমন করে উঠল।

প্রথমে প্রেক্ষাগৃহবিশিষ্ট রন্দ্বগমঞ্চেআলোসরবরাহকরত মোমবাতি কিংবা তেলের বাতি। এই মোমবাতি কিংবা ল্যাম্পের আলো সামনে থেকে পড়ত মঞ্চের ওপরে। তারপরে এলো গ্যাসের আলো। গ্যাসের আলোই ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপের উৎস। অর্থাৎ ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপ ব্যবহার রন্দ্বগমঞ্জে দেখা গেল গ্যাসের আলো আসবার পর থেকে। তারপর শহরে বৈদ্যুতিক আলো আসবার সন্দেগ সন্দেগ শহুরে সভ্যতায় ঘটে গেল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সেই রকম বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেল রন্দ্বগমঞ্চেও। এই আলো সব কিছুই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই দর্শকের সামনে তুলে ধরল।

বাংলা রন্দ্বগমঞ্চেও এ বম্বিধ পরিবর্তন এলো। গণনাট্যের 'নবান্ন' নাটকে আলোকসম্পাতের একটা দারুণ শিল্পসম্মত সুযোগ আছে। আলোর এই শিল্পসম্মত প্রয়োগ না হলে 'নবান্ন' নাটক অত জীবন্ত হয়ে উঠতে পারত না। ছেঁড়া চটের টুকরো দিয়ে মঞ্চস৭া চলে, কিন্তু আলোর প্রয়োগকৌশল আরোপিত না

হলে ছেঁড়া চট চটই থেকে যায়। মঞ্চমায়া সৃষ্টি হয়না। এই নাটকের কোনো কোনো স্থানে প্রতীকধর্মী পরিবেশ সৃজনে আলো অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তার ফলে 'নবান্ন' হয়ে উঠেছে বাস্তবের জীবন্ত নাট্যরূপ।

আলো কেমনভাবে নাটকে এত জীবন্ত বাস্তবের প্রতিরূপ গড়ে তোলে তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহারের সময় থেকে বাংলা নাটকের প্রয়োগরীতিতে সংযোজিত হয়েছে অভিনব এক অধ্যায়। আদিতে ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপের ব্যবহার হত। রঙ্গমঞ্চের সামনের দিকে প্রান্তিক অঞ্চলে একফুট উঁচু করে ফুটলাইট বসানো হত। এর ফলে তার থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিপুঞ্জ অভিনেতা অভিনেত্রীদের ওপর পড়ে সৃষ্টি করত একটা প্রস্থছায়া। সেই ছায়া পশ্চাৎপটের ওপর পড়ে একটা কিম্ভুতকিমাকার পরিবেশ তৈরি করত। ফলত দর্শক মনে সামগ্রিক ইম্প্রেশন সৃষ্টিতে বাধা হত। তাই প্রথমে প্রয়োজন হল পশ্চাৎপটের এই ছায়া দূর করবার। তাই প্রসেনিয়ামের পিছনে টাঙানো দু'ফুট চওড়া ঝালর স্থাপিত রঙ্গপীঠের ওপর থাকত-এর অন্তরালে ঝোলান হত বালবের ছড়ি। এইভাবে চতুর্দিক আলোয় ঝলমল করে ওঠবার ফলে ছায়া স্পষ্ট হয়ে পশ্চাৎপটে পড়তে পারলনা। প্রচ্ছায়া ভূতটা রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিল।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'সীতা' নাটক প্রযোজনা কালে ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপ তুলে দিলেন। পাদপ্রদীপ তুলে দেওয়ার যুক্তিগ্রাহ্য কারণগুলো এইরকমঃ দিবাভাগে সূর্য পূর্বাকাশে ওঠে। সারাদিন ভূপ্রদক্ষিণ করে অপরাহ্ণবেলায় পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। রাত্রে চাঁদ থেকে শুরু করে ইলেকট্রিকের আলো, গ্যাসের আলো প্রভৃতি সবই ওপর থেকে পড়ে, নয়তো আসপাশ থেকে পড়ে। আলোক রশ্মি প্রক্ষেপণের এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই স্বাভাবিক নিয়মে শিশির ভাদুড়ী মঞ্চে আলোক ক্ষেপনের ব্যবস্থা করলেন, তাই তিনি তুলে দিলেন ফুটলাইট, আমদানী করলেন ফ্লাডলাইট, স্পটলাইট। সাধারণভাবে সমস্ত মঞ্চ আলোকিত করবার জন্য ফ্লাডলাইট। পার্শ্বলাইট থেকেও আলো সরবরাহ করা যেতে পারে। আর কোনো বিশেষ স্থান, বিশেষ মুখ বা অবয়ব বা অভিব্যক্তিকে স্পষ্ট করে তোলবার জন্য তিনি ব্যবহার করলেন স্পটলাইট। স্পটলাইট হল তাইঃ যা নির্দিষ্ট কোনো অংশ বা স্থানকে আলোকিত করতে পারে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আলোক নিক্ষেপণ যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হল ডিমার বা ধীরে ধীরে আলো বাড়াবার কমাবার যন্ত্র।

এই ব্যবস্থার গুরুত্ব এই যে হঠাৎ আলো জ্বলল এবং তীব্র আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হল বা হঠাৎ আলো নিভে গেল, এতে মঞ্চের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয় এবং অভিনেতার অভিব্যক্তির ক্রমবিলীয়মান রূপটা ঠিকভাবে ফুটে উঠে অভিনয়কে ব্যঞ্জনার পর্যায়ে নিয়ে যেতে বাধা প্রদান করে। ধরা যাক 'নবান্ন' নাটকের একটি দৃশ্য, যেখানে কুঞ্জর হাতে কুকুরটা কামড়ে দিয়েছে। সেই রক্তাক্ত কম্পিত হাতটা নিয়ে যে যন্ত্রণাকাতর মুখে রাধিকার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর রাধিকা নিজের পরনের কাপড় ছিঁড়ে তা দিয়ে হাতের ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিচ্ছে এবং একসময় দুজনে দুজনার মুখের দিকে গভীর প্রেম ও মমতাঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে আর আলোটা একটু একটু করে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই অংশে পাত্রপাত্রীর

মুখে কথা নেই, কিন্তু আলো এই অংশে কথা বলছে। বেদনাঘন মুহূর্তটা দর্শক মনের পরতে পরতে গেঁথে দিয়েছে। এখানে স্পটের সন্দেগ ডিমার যদি না থাকত, তাহলে আলোটা দপ করে নিভে যেত। শেষ, মুহূর্ত পর্যন্ত কুঞ্জ রাধিকার উদ্বেল হৃদয়ের রশু ক্ষরণ দেখান সম্ভব হত না, যা তাদের নীরব দৃষ্টির অশ্রুক্ষরণের মধ্যে দিয়ে দর্শক মনের প্রত্যন্ত প্রদেশের নিস্তু রন্দ্বগতায় বেদনার ত রন্দ্বগকে উদ্বেল করে তুলছে। একাজ করেছে ডিমার যুশু স্পটলাইট। এতএব স্পটলাইট আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র।

এরপর আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে আরো বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন সতু সেন। সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি পেশাদার রন্দ্বগালয়ের সন্দেগ নিজেকে যুশু করেন। আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে সতু সেন বিস্ময়কর পরিবর্তন আনলেন, নাট্যনিকেতন মঞ্চে 'ঝড়ের রাতে' নাটকে। বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের সাহায্যে রন্দ্বগমঞ্চেঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ ইত্যাদি খুব বাস্তব রূপে তিনি ফুটিয়ে তোলেন। রঙমহলে 'স্বামী স্ত্রী' নাটকে কয়লার খনির যে দৃশ্য দেখান হয়েছিল তা দর্শকদের বিশেষ ভাবে চমৎকৃত করে। পরবর্তীকালে তাপস সেনের নাম এ প্রসন্দেগ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

আলোর এই বিস্ময়কর চাতুর্য অবশ্য ঘটেছিল বাঁধা মঞ্চগুলিতে, যা পেশাদার মঞ্চ বলে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু পেশাদার মঞ্চের বাইরে মঞ্চ তৈরি করে সেখানে আলোর খেলা দেখাবার কৃতিত্ব বোধহয় গণনাট্য সংঘের। এখানে 'নবান্ন' নাটকে আলো কি রকম প্রতীকধর্মী অভিনয় করেছে তার একটু পরিচয় নেওয়া যাক। দ্বিমাত্রিক মঞ্চেদ্বিতীয় অন্দেকর তৃতীয় দৃশ্যের অভিনয় চলেছে। বিয়ে বাড়ি, ফটকের ভেতর দিয়ে বাড়ির মধ্যে যাওয়ার রাস্তা। দু'পাশে চেয়ার পাতা, সেখান দিয়ে লোকজন ভেতরে যাচ্ছে, ভেতর থেকে আসছে, একপাশে বাড়ির কর্তা এবং তার সান্দগপান্দগদের কথা বার্তা চলছে। এখানে আলো খুব উচ্চল। অর্থ, বৈভব, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর উৎসবের উদ্দাম আনন্দের সন্দেগ আলো এখানে যথেষ্ট সন্দগতিসম্পন্ন। ঠিক এরই একপাশে রাস্তা, একটা ডাস্টবিন, সেখানে কুকুর আর মানুষের সহাবস্থান। উভয়ে ডাস্টবিন ঘেঁটে খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত। এখানে আলো অল্প। নাট্যকার তারই নির্দেশ রেখেছেন। নাট্যকারের নির্দেশ থেকে একটা তাৎপর্য বেরিয়ে আসে, এই সব গরীব ভিখিরি মানুষগুলোর জীবনে সুখ নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই, তাই আলোও নেই। নৈরাশ্য আর অসহায়তার তমিস্রায় তাদের জীবন আচ্ছন্ন। সুতরাং এখানে উচ্চল আলো একান্ত অপ্রয়োজন। স্পটলাইটের স্বল্পালোকে তাদের সামাজিক অবস্থানের প্রতীকধর্মী মঞ্চরূপ গড়ে উঠেছে। এই দৃশ্যে দুই স্তরের মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্দেশে আলো এখানে প্রতীকধর্মী ভূমিকা পালন করেছে।

অবশ্য আলো ছাড়া আরো একটি বস্তু নাটকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা হল আবহসংগীত। যেটি নেপথ্য বিধানের তৃতীয় বস্তু। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে, নাটকের পরিভাষায় আবহসংগীতের অর্থ এইভাবে করা যায় যে, নাট্যাভিনয়কালে দর্শকদের দৃষ্টির অন্তরালে কৃত অভিনয়ের ঘটনার অনুসন্দগী সংগীত, ইংরাজীতে যাকে background music বলে। আবহসংগীতের আভিধানিক অর্থও তাই। সংগীত নাটকের পাত্রপাত্রীর অভিনয় দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশকে আরো বেশি জীবন্ত, মর্মস্পর্শী করে তোলে, বা অভিনয় করার জন্য উপযুশু পরিবেশ সৃষ্টি করে যে সংগীত তাকে আবহসংগীত বলা হয়। 'নবান্ন' নাটক থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া

হয়েছে। দ্বিতীয় অন্দ্বক তৃতীয় দৃশ্য। বিবাহ বাড়ি, মঞ্চসজ্জা, পাত্রপাত্রীর সাজসজ্জা এবং তাদের সংলাপের মধ্যে দিয়ে বোঝাবার পক্ষে কোনো অসুবিধা নেই যে দৃশ্যটা বিবাহের। তাহলেও নাট্যকার নির্দেশ দিলেন যে, এখানে সানাই-এ 'আশাবরীর আলাপ চলেছে বিলম্বিত তানে'। এর কারণ এটাই বিবাহের অনুষ্ঠানে সানাই-এর একান্ত অপরিহার্য 'রাগ'। অর্থাৎ কথাটা এই দাঁড়াল যে পরিবেশ সৃষ্টি। উশু দৃশ্যকে বাস্তু বধর্মী করে তোলবার জন্য এটি একটি স্বাভাবিক প্রয়াস।

কিন্তু প্রশ্ন, যে দৃশ্যে নাট্যকারের নির্দেশ নেই, সেখানে কি তাহলে আবহসংগীত হবে না? যেমন ধরা যাক, কুঞ্জর রশুাশু হাত দেখে রাধিকা চমকে 'ওমা একেবারে কামড়ে খেলে গো' বলে সে সংলাপটা উচ্চারণ করল, এখানে ওই চরিত্রের আতন্দ্বিকত হওয়া, পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে, অনুরাগ রঞ্জিত হৃদয়ে 'ভারি পাজি কুকুর তো। কামড়ে দিলে গা।'—সংলাপ-অনুভূতি স্তু রগুলিকে আরো হৃদয়গ্রাহী করে তোলবার জন্য আবহসংগীতের কি দরকার নেই? প্রথমে 'ওয়াইলড্‌লি' চিৎকার, তারপর রাধিকা যখন দেখে কুকুর অনেকখানি কামড়ে নিয়েছে তখন ত্রস্তে পরনের কাপড়টা ছিঁড়ে নিয়ে বেঁধে দিতে দিতে অসহায় বোধ নিয়ে বলে, 'ওমা আমার কি হবে গো' বা গভীর মমতায় 'খুব যন্তন্না হচ্ছে, নাঙ্গ জল এনে দেব জল? একটু জল খাবে?' প্রভৃতি উচ্চারণ সংবেদনশীল হৃদয়ের অনুভূতিকে গভীরতম তলে পৌঁছে দেয়। এটিকে প্রকাশ করতে নিঃসন্দ্রেহে অভিনেত্রীর অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতার দরকার, এর জন্য প্রয়োজন স্বরগ্রামে—এই খেলা অতিসাধারণ অভিনেত্রীর পক্ষে সম্ভব হবে না। এটা যেমন অভিনেত্রীর ক্ষমতার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল, ঠিক তেমনই আবহসংগীত অভিনেত্রীকে অনেক বেশি সাহায্য করে দর্শক হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করার জন্য। আর একটি জায়গা, প্রথম অন্দ্বেকর তৃতীয় দৃশ্য, প্রতিবেশী দয়াল প্রধানের বাড়ি থেকে চাল চেয়ে নিয়ে গেছে অভুশু স্ত্রী রাঙার মাকে খাওয়াবার জন্য। কিন্তু গিয়ে পৌঁছানর পূর্বেই বন্যা অতর্কিতে আক্রমণ করে নিয়ে গেছে সকলকে ভাসিয়ে, বিপর্যস্তু, ক্ষতবিক্ষত সর্বহারা দয়াল এর পর উন্মাদের মতো ছুটে আসছে কুঞ্জর কাছে বাইরে থেকে 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক দিতে দিতে।

ঃনেপথ্যে 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাকৰ

কুঞ্জ। ঃউৎকর্ণ হয়েৰ য়্যাঃ ... কুঞ্জঙ্গ ... কেঙ্গ

ড উন্মত্তঅ বস্টথায় দয়ালের প্রবেশ্

দয়াল। কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জ।

কুঞ্জ। দয়ালদা। কী হয়েছে দয়ালদা?

দয়াল। ঃকোঁচড়ের চাল হাতে নিয়েৰ এই যে কুঞ্জ, তোর, তোর সেই চাল ক'টা। তোর সেই চাল ক'টা।

কুঞ্জ। ঃবিস্মিতের ভন্দ্বিগতেৰ দয়ালদাঙ্গ দয়ালদাঙ্গ

দয়াল। ঃস্বপ্নোত্থিতের মতোৰ য়্যাঁঃ, কোনো কিছু ছিল নাকি আমার কোনো দিন? ছিল কি কেউ? কোথায় গেলঙ্গ আমার কি কিছু ছিল নাঙ্গঙ্গ

কুঞ্জ। রাঙার মায়ের জন্যে যে তুমি।

দয়াল। রাঙা র মা, কোথায় গেল রাঙা র মা, কোথায় গেল রাঙাঙ্গ আমা র ঘ র, কোথায় গেল আমা র ঘ রঙ্গ বুঞ্জঙ্গঙ্গ

প্রধান। দয়ালঙ্গঙ্গ

দয়াল। প্রধান, সমুদ্দু র, চা রদিকে শুধু সমুদ্দু র—জল আ র জল, কিছু নেই শুধু জল...সমুদ্দু র উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙা র মা, রাঙা, রাঙা র মা রাঙা র মাঙ্গঙ্গ

ঝড়ে র শব্দ—সাঁই সং.

দৃশ্যাংশটুকু র অভিনয় পু রোটাই আ বহসংগীত নির্ভ র। নাট্যকা রে র নির্দেশ থাক বা না থাক, অভিনেতা যতই ক্ষমতাসম্পন্ন হোন, দর্শক মনে গভী র ভা বে ছাপ ফেল বা র জন্য এখানে আ বহসংগীতে র একান্ত ঘনিষ্ঠ এ বং আন্তরিক সহযোগিতা র খু ব দ রকা র। কিং বা দ্বিতীয় অংকে র তৃতীয় দৃশ্যে যেখানে রাধিকা কুঞ্জ র হাত বেঁধে দি২ছ আ র কাঁদছে—তা রপ র উভয়ে উভয়ে মুখেণ্ণ দিকে তাকিয়েঃএই অতি গু রুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আ বহসংগীত তো এদে র অ ব্যশু বশু ব্যকে, নিবিড় প্রেমে র নিদা রুণ বেদনাকে দর্শকে র দ র বারে পৌঁছে দেবে।

আ বহসংগীত বলতে আম রা বুঝি এ্যাফেক্ট মিউজিক অর্থাৎ প্রভা ব বিস্তা রকা রী সু রলহ রীকে আ র শব্দ সংযোজনাকেও এই অংশে র সন্দেগ যুশু ক রা হয়। 'নীলদর্পণে' র কথা ধ রা যাক, যেখানে চা রজন রাইয়ত হঠাৎ অফ ভয়েসে মজুমদা রে র কণ্ঠস্ব র শুনতে পেল। সেই মুহূর্তে মনে আতন্দ্বক জেগে উঠল। আ বহসংগীতে র প্রভা ব এখানে অনস্বীকার্য। অথ বা, ক্ষেত্রমণি র প্রতি রোগ সাহেবে র অত্যাচা র দৃশ্যেঃআ বহসংগীত ছাড়া এ দৃশ্যে র অভিনয় চিন্তা ক রা যায়না। 'ন বান্ন' নাটকে র প্রথম অন্দেক র পঞ্চম দৃশ্যে র শেষাংশেঃ

হা রু দত্ত। জ্বকুঞ্জে র মুখে র ওপ র লাঠি ঠুকেৰ বড় যে লম্বা-চওড়া কথা, উঁ? বড় যেঃ। জ্বলাঠি ঠুকেৰ কেন, কা রসন্দেগ কী কথা বলিস ঠিক থাকে না? উঁ, মনে থাকে না?

ড অপমানহত কুঞ্জ গুমরে কাঁদে শিশু র মত.

প্রধান। মেরে ফেলোনি বা বা ওরে। বা বা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।

২য় ব্যশ্তি। এই ওপ্। জ্বলাঠি খেয়ে প্রধান বসে পড়েৰ

জ্বকুঞ্জ র কান্না আ রও জো রালো হয়ে ওঠে। রুগণ মাখন তা র সমস্ত শশ্তি সংহত ক রে উঠে দাঁড়া বা র চেষ্টা ক রতে গিয়ে মাথা ঘু রে পড়ে যায় মাটিতে। ছুটে যায় বিনোদিনী, রাধিকা, প্রধান। ম রণাহত মাখনে র মুখে র ওপ র গিয়ে স ব হুমড়ি খেয়ে পড়ে।ৰ

রাধিকা। হায় হায় হায় হায়, আমা র স ব গেল গো, স ব গেল। ও মাখন, মাখন—

প্রধান। জ্ববিনোদিনী র প্রতিৰ এট্টু, জল, জল আন। জল—

রাধিকা। ও মাখন, মাখন রে—

জ্বআর্তকণ্ঠে মাখন গাঁইগুই শব্দ ক রতে থাকেৰ

প্রধান। মাখন, মাখন রে ে-ে◌ঃ, —কুঞ্জ, দ্যাখ, মাখনরে এক বা র তুই দ্যাখ্।

জ্বরাধিকা কেঁদে ফেটে পড়ে। ভয়বিহ্বল বিনোদিনী র চোখমুখ ভেঙে নেমে আসে একটা সমূহ বিপৎপাতে র কালো ছায়া।ৰ

কুঞ্জ। জ্বমুখ তুলে মাখনে র দিকেৰ য়াঁ, মাখন, মাখন...

প্রধান। মাখন চলে গেলিঙ্গ

এই অংশে যেখানে সংলাপ আছে সেখানে তো বটেই, যেখানে সংলাপ নেই সেখানেও আ বহসংগীত খু ব গু রুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন না ক রলে পু রো ব্যাপা রটা মর্মগ্রাহী হয়ে উঠতেই পা রবে না।

অতএ ব নাটকে আ বহসংগীত একান্ত অপরিহার্য একটি নেপথ্য বিধান। এই বিশেষ নেপথ্য বিধানটি নাট্যাভিনয়ে র প্রথম দিকে বিশেষভাবে অ বহেলিত ছিল। এটা নাট্যাভিনয়ে র সন্দেগ ঘনিষ্ঠ অন্দগ হিসেবে দেখা হয়নি। তাই যত্রযত্র যে রকম সে রকম musical instrument ব্য বহা র ক রা হত। তা র যুক্তি সংগত কা রণও ছিল। তখন প রিচালক রা অভিনয়ে র ওপ র জো র দিতেন, আ র দর্শক রা অভিনয়টাই দেখতে যেতেন। তাই চ রিত্রে র মুখে নাট্যকা র রা জুগিয়ে দিকেন অজস্র কথা র বুনানী অর্থাৎ সংলাপ। অভিনেতৃ বর্গ কণ্ঠস্বরে র উৎক্ষেপণ—কম্পনে র মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন স্ব রগ্রামে নিয়ে গিয়ে দর্শক মনে দাগ টান বা র ব্য বস্থা ক রতেন। তাই আ বহসংগীত ব্যাপা রটা তখন নেহাতই গৌণ ছিল। সম্ভবত, সেই কা রণে 'নীলদর্পণে'র মত নাটকে র প্রথম অভিনয়ে চুনাগলি র ফিরিন্দ্বিগ কনসার্ট ব্য বহা র ক রা হয়েছিল। তা র জন্য সমকালীন সং বাদপত্রে এই বিসদৃশ সংগীত সংযোজনা র যথেষ্ট বি রূপ সমালোচনা ক রা হয়েছিল। অ বশ্য প্রথম দিকে থিয়েটা রে ফিরিন্দ্বিগ কনসার্টই ব্য বহা র ক রা হত। লে বেডফ তা র নাটকে বিলিতি বাজনদা রদে র এনেছিলেন। কিন্তু মোট কথা, তখনকা র দিনে নাট্যাভিনয়ে ফিরিন্দ্বিগ কনসার্টে র নিঃসপত্ন আধিপত্যকে অস্বীকা র ক রা যা বেনা। প র বর্তীকালে নাট্যাভিনয়ে বী র, ক রুণ ইত্যাদি রস বোঝানো র জন্য, ক্লাইম্যাক্স বোঝানো র জন্য ঝাঝ, বেহালা ইত্যাদি যন্ত্র ব্য বহা র ক রা হয়েছিল। তখন বেহালা, ক্লারিওনেট, বিভিন্ন পর্দা র আড় বাঁশী, ছোট বড় নানা রকমে র ঝাঝই ছিল আ বহসংগীতে র উপক রণ।

নাট্যাভিনয়ে সুসংহত, সুপ্রযোজিত আ বহসংগীতে র প্রয়োগ ক রলেন শিশি রকুমা র ভাদুড়ী। তা র 'সীতা' নাট্যাভিনয় থেকেই প্রথম আ রম্ভ হয় নাট্যক্রিয়াকে তী ব্রত র এ বং অভিনয়ে র রস ঘনীভূত ক রে তোল বা র জন্য আ বহসংগীতে র সুসংহত ব্য বহা র। এই কাজ ক র বা র জন্য তিনি তখনকা র ব্রডকাস্টিং কপপোরেশনে র বাংলা কর্মসূচী র অধ্যক্ষ অদ্বিতীয় ক্লারিওনেট বাদক নৃপেন মজুমদা রকে ডেকে আনেন। 'স্বর্ণসীতা গড় বা র প্রয়োজনে যখন ভা র বাহী রা সোনা র তাল বহন ক রছে নী রবে, তখনকা র তী ব্র বি রহ বেদনাসূচক আ বহসংগীত আজও আমা র কানে বাজছে'—একথা বলেছিলেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

প র বর্তীকালে বাংলা নাটকে র ক্ষেত্রে আ বহসংগীত একটা আলাদা মর্যাদা র আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাট্যাভিনয়ে নেপথ্য বিধানে র এই অন্দগটি র অনুপস্থিতি আজ আ র কল্পনা ক রা যায় না। বাচিক অভিনয় হোক, মুকাভিনয় হোক কিং বা অন্দগাভিনয় হোক, আ বহসংগীত সমান তালে চলতে থাকে। অভিনেতা র

বিভিন্ন মুডকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। বিভিন্ন ভাষাহীন অভিব্যক্তির ভাষা প্রদান করে আবহসংগীত নাটকের একটা সামগ্রিক রসরূপ, শিল্পরূপ গড়ে তোলে। যা উপরিস্তরে ভাসমান থাকে, তাকে গভীর থেকে গভীর স্তরে নিয়ে গিয়ে একটা দাগ কেটে দেয়। অর্থাৎ কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে মনপ্রাণ আকুল করে তোলে। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে আজ আবহসংগীতের নিঃসপত্ন আধিপত্য।

নাট্যসাহিত্যে সাধারণ নাট্যশালায় প্রথম শতকের ন্যূনাধিক শেষ দু'দশক নাট্যজগতের গৌরবজনক অধ্যায় বলে চিহ্নিত হতে পারে ঠিক, কিন্তু নেপথ্য বিধান সম্পর্কে অর্থাৎ মঞ্চ আলো ও আবহসংহীত সম্পর্কে পথিকৃৎ হয়েছে দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাগত অপেশাদার গোষ্ঠী। তার মধ্যে প্রধান হল গণনাট্য সংঘ। 'নবান্ন' নাটকে 'গণনাট্য সংঘ' প্রত্যক্ষ ও নেপথ্য জগতের সুসংহত মেলবন্ধন ঘটিয়ে টীমওয়ার্ক ধর্মী নাট্য পরিবেশন রীতির প্রবর্তন করে—এ সম্পর্কে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারেন বটে তবে কালের বিচারে তা গ্রাহ্য হবেনা। 'নবান্ন' নাটকেই প্রথম দেখা গিয়েছিল বস্তুনিষ্ঠ কাহিনী অতি প্রচলিত ভাষার রথে চেপে ধবনি, আলোক ও মঞ্চকৌশল সমন্বিত বাস্তবানুগ পরিবেষ্টনীর মাঝে খুবই বিশ্বাসগ্রাহ্যভাবে যাত্রা শুরু করে অতি সহজেই দর্শক হৃদয় জয় করে ফেলেছিল। সেদিনই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ বুঝেছিল অভিনয় জগতে একাধিপত্যের দাপট আর খাটবে না। তাকে টেক্কা দেবার মতো শিশু জন্মগ্রহণ করে গেছে। এখানেই গণনাট্য সংঘের আন্দোলন, এখানেই বিজন ভট্টাচার্যের নাটকের বিশেষত্ব। এখানে একান্ত বাস্তবধর্মী 'নবান্ন' নাটকের নেতৃত্ব। তাই বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস 'নবান্ন' নাটকটিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হয়। দেখা হয় এইজন্যে যে, এই নাটকের মধ্যে দিয়ে সূচিত হয়েছিল নাট্য আন্দোলন। জীবন ও গভীর জীবন প্রত্যয় যার বিষয়, জীবনের বাস্তবানুগ উপস্থাপনা যার লক্ষ্য। বশুব্য মানুষের পক্ষে—খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে—শোষণ নিপীড়ন-এর বিরুদ্ধে।

৪৮.১৬ 'নবান্ন'-এর শেষ দৃশ্যের তাৎপর্য

চতুর্থ অন্দক তৃতীয় দৃশ্যের পর নাটকের 'যবনিকা' পাত ঘটেছে। এটিই শেষ দৃশ্য। এ দৃশ্যের পটভূমিকা 'মরা গন্দগার ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সুদূর দিগন্তের পছিমাকাশে অস্তমিত সূর্যের রশ্মি মাভা। পরিবেশ কলহাস্যমুখর। নবান্ন উৎসব চলছে। মোরগের লড়াই, লাঠিখেলা ও কৃষাণীদের গানে মুখরিত সমগ্র অঞ্চল।' ইতোমধ্যে এই অন্দেকর প্রথম দৃশ্যে শহর থেকে ফেরা নিরঞ্জন-বিনোদিনীর নতুন করে গুছিয়ে নেয়া সংসারে কুঞ্জ-রাধিকার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। তৃতীয় ও শেষ দৃশ্যে অকস্মাৎ 'আবর্জনার কাঁড়ি বগলে নিয়ে' প্রধান সমাদ্দার 'মাথা নাড়তে' প্রবেশ করে। এমনাড়তেভাবে প্রথম অন্দক প্রথম দৃশ্যে যে দুর্যোগের ঘনঘটনার সূচনা, পরে বিস্তার, সমাদ্দার পরিবারের বিপর্যয় ও বিচ্ছেদ, শেষ দৃশ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিবারের সব স্বজনের পুনমিলন এবং সেই সন্দেগ দয়ালের বশুব্য 'মন্বন্তরের দাপট গিয়েছে, তবু মরিনি...আমরা', 'এবার আর আকাল এসে আত্মীয় পরিজন ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না', 'জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবারঙ্গ জোর

প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ'—প্রভৃতি আ৫বাক্য সুলভ সংলাপের অতিনাটকীয়তা ও পূর্বাপর রহিত অপ্রত্যাশিত ঘটনার আতিশয্যের জন্যই, নাটকাভিনয় দেখে, সে দিন এই দৃশ্যটি সম্পর্কে কিছু প্রতিকূল সমালোচনা হয়েছিল।

শ্রীরঙ্গম মঞ্চেএকাদিক্রমে সাত রাত্রি অভিনয়ের পর 'নবান্ন' নাট্যামোদী, বুদ্ধিজীবী মহলে প্রবল সাড়া এনে দিয়েছিল। নাটক ও প্রযোজনার অন্যতর চিন্তা-ভাবনার অভিব্যক্তি এক নতুন দিগন্ত্রের আভাস এনে দেয়। গণনাট্যের জয়যাত্রার শুরু এখান থেকে।

নতুন ভাবনা ও প্রযোজনার দিক থেকে 'নবান্ন' যতটা অভিনন্দিত হয়েছে, সাহিত্য হিসাবে নাটকটি ততটা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এর ঘটনা পরম্পরা একটি অখণ্ড কাহিনীর ক্রমবিকশিত রূপকে তুলে ধরার চেয়ে, নাটকীয় আবেগকে একমুখী করে তোলার চেয়ে, ঘটনার বহুধা ব্যাপ্তি ও আবেগ বৈচিত্র্যের প্রতি বেশি মনোযোগী। সাধারণ কৃষক ও নিম্নবিত্ত কতকগুলি মানুষ ও তাদের সমাজজীবনের অবলম্বন হলেও তাকে নাট্য রসাশ্রিত করার জন্য যে প্রতিভার প্রয়োজন, সে পরিচয় নাটকটিতে পরিস্ফুট হয়নি। তাই নবান্নের কোনো কোনো দৃশ্য পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এঁদের কেউ কেউ শেষ দৃশ্যটিকে নবান্নের দুর্বলতম অংশ বলে মনে করেন। ''নবান্ন' অক্ষম শুধু এই কারণে যে এর শেষ অংশ পূর্ববর্তী অংশগুলি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ওই অংশগুলিতে ঘটনা বিবর্তনের যে সূত্র পাওয়া যায় শেষ দৃশ্যে এসে তা একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে, ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি হয়েছে একেবারে পণ্ড।'' ''এই দৃশ্যে গ্রন্থাকার যেভাবে তার উদ্ভাবিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন, তা শুধু রোমান্টিক ও অবাস্তব নয়, নাটকটির পূর্বাংশের সন্দেগ একেবারে সন্দগতিবিহীন।'' জ্ল'নবান্ন'—হিরণকুমার সান্যাল, পরিচয়, চৈত্র ১৩৫১ৰ।

সমালোচকের বশুব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, নাটকটির প্রথমাংশে গ্রাম বাঙলার জনজীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়ে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি ও তৎসহ নাট্য কাহিনীতে একটি গতিবেগ আনবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, তা অনেকটা স্বাভাবিক ও বাস্তবানুগ।

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিঃ রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ঘটনার টানাপোড়েন, দুর্ভিক্ষ মহামারী— বন্যায় বিপন্ন মানুষের স্বপক্ষে বশুব্য উপস্থাপনার দায় নিয়ে সেদিন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাঙলা শাখার ওপর কিছু দায়িত্ব বর্তে ছিল। প্রয়োজন ছিল সাধারণ মানুষকে আর্ত জনসাধারণ সম্পর্কে সচেতন এবং ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ নবান্ন নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে সে দায় ও দায়িত্ব সম্যকভাবে পালন করেছে।

চার অন্দেক বিন্যস্ত 'নবান্ন' নাটক বন্দগদেশের অনাদৃত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রথম আলেখ্য। প্রথম বাংলার চাষী মজুরের 'দুর্ভোগ-দুর্দশার নৈরাশ্য-সংকল্পের চমৎকার বাস্তব বসম্মত চিত্র'। এর পটভূমিতে আছে তৎকালের বাংলাদেশের তিন বৎসরের ঘটনা। ১৯৪২-৪৪ সালের গ্রাম বাঙলার জনজীবনের পক্ষে উল্লেখযোগ্য নানা রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক ঘটনাকে নাট্যকার অতি স্ব২ছন্দভাবে এ নাটকে তুলে ধরেছেন। উদ্দেশ্য গণজীবনের বিস্তৃত পরিসরটি তুলে ধরার সন্দেগ সন্দেগ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পোড় খাওয়া মানুষের মাধ্যমে

নতুন এক বলিষ্ঠ সংগ্রামশীল জীবন দর্শনকে প্রকাশ করা, যার প্রতিপাদ্য 'সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধেসন্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ' চেতনা সঞ্চার করা। গণনাট্য আন্দোলনের কর্মী নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য তাঁর এই প্রতিপাদ্যটি তুলে ধরবার জন্য প্রাথমিকভাবে দুর্গত পল্লী ও পল্লী বাসীর সন্ধকটের স্বরূপ তুলে ধরেছেন প্রথম অন্দেকর দৃশ্য পরম্পরায়। প্রথম দৃশ্যের পটভূমি : বিশ্ব ব্যাপী মহাযুদ্ধআর এখানে '৪২-এর আগস্ট আন্দোলন দেশ ব্যাপী অগণিত মানুষের সংগ্রাম ও সাম্রাজ্য বাদী ইংরেজের রশুাশু সন্ত্রাস সৃষ্টির ঘটনাকে নাট্যকার বর্ণনা করেছেনঃ''সুদূরের পটভূমি রশ্মি ম। ... হঠাৎ নতুন কোনো কিছুর আহুতি পেয়ে পটভূমিটা আরও রশ্মি ম হয়ে উঠলহ্লু, আর ঊধর্বগতি ধূমকুণ্ডলীর সন্দেগ উড়তে লাগল ছাই আর আগুনের ফুলকি।''ঃএ থেকে বোঝা যায় বাঙলার রাজনৈতিক পটভূমি তখন অগ্নিগর্ভ। এ হেন পরিস্থিতিতে আমিনপুরের কৃষক প্রধান সমাদ্দার তিন গোলা ধান নষ্ট করে, নৌকা আটকে রাখে, আবার দুই ছেলেকে নিয়ে আগস্ট আন্দোলনেও যোগ দেয়। তার স্ত্রী পঞ্চননী পুলিশী সন্ত্রাস অত্যাচারের ভয়ে ভীত 'মেয়েমানুষের ল৭া শরম খুইয়ে বনেজন্দগলে গিয়ে' পহরের পর পহর বসে গ্লানির প্রতিবাদ করেও যখন কোনো সুরাহা হয় না দেখে তখন নিজেই বিদ্রোহের মশাল হাতে জনতার নেতৃত্ব দেয়, অবিচল দৃঢ়তায়হ্লু, উদ্বুদ্ধকরে এগিয়ে যেতে। পক্ষান্তরে, কুঞ্জ মনে করে দেশের মানুষের প্রস্তুতিবিহীন সংগ্রাম আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। আর যুধিষ্ঠিরের সংলাপ নেহাৎই প্ররোচনাকারীর বশু ব্য। সব মিলিয়ে দৃশ্যটিতে বিশ্বযুদ্ধও আগস্ট আন্দোলনের উত্তেজনার দিনগুলোর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বাঙলাদেশের মানুষ সেদিন যুবা বৃদ্ধ নির্বিশেষে নানাভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তা বোঝা যায়। এ তো নেপথ্যভূমি।

দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ দৃশ্য প্রধানের ছন্নছাড়া গৃহস্থালীর বিস্তৃত বর্ণনায় সমৃদ্ধ। অভাবের তাড়নায় সমাদ্দার পরিবার বীজধানের শেষে ঘরের থালা বাসন বিক্রি করে মুখের গ্রাস সংগ্রহ করছে, তৎসত্তেওও সহৃদয়তা হারায়নি। প্রতিবেশী দয়ালকে সংগৃহীত সামান্য খুদকুঁড়ো থেকে মুঠোকখানেক দিতে দ্বিধা করেনা। নিরঞ্জন এ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে পড়ে কাজের সন্ধানে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। দুর্দৈব এতক্ষণ বোধ করি প্রতীক্ষা করছিল। আকস্মিক দমকা বাতাসকে সন্দেগ নিয়ে সাত-আট হাত উঁচু হয়ে আসা বান আর প্রবল ঝড়ের তাণ্ড বলীলা চলতে থাকে। প্রধানের দোচালা ভেঙে 'ঘর বার' সব একাকার হয়ে যায়। এর সন্দেগ তাল মিলিয়ে মহামড়ক উজাড় করতে থাকে গ্রামের পর গ্রাম। তবু এরই মধ্যে বাঁচবার সংগ্রাম চলে, সমাদ্দার পরিবারের। এ হেন বিপর্যয়ে, সন্ধকটে হায়েনা রা স্থির থাকতে পারেনা। তাদের লোভী দৃষ্টি মানুষের শেষ সম্বলটুকুতেও হাত বাড়ায়। হারু দত্তগ্রামের মহাজন, সমাদ্দারদের অভাবের সুযোগ নিয়ে জমি কাড়তে উদ্যত হলে, কুঞ্জ বাধা দেয়। পরিণামে হারুর লাঠিয়ালের আঘাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়-তৃতীয় অন্দক সমাদ্দার পরিবারের শহরবাসের ইতিকথা। ভিন্নতর পরিবেশে অনভ্যস্ত জীবনচারণে প্রতিপদে আত্মাবমাননা সহ্য করতে না পেরে প্রধান, গ্রাম বাঙলার পিতৃপুরুষ, কেমন যেন পাগলের মতো হয়ে যায়। কুঞ্জ, রাধার নগরজীবনের সীমাহীন হৃদয়হীনতায় স্বগ্রামে ফিরে যাবার সংকল্প নেয়। কালীধন সেবাশ্রমে জ্ব?ব বিনোদিনীর সন্দেগ নিরঞ্জনের পুনর্মিলন ও ধাড়ার সমস্ত হীন ব্যবসার পুলিশ সংবাদ দিয়ে, সচক্র ধরিয়ে দেয় এবং পরিশেষে তারা ঘরে ফেরে।

বস্তুত প্রথম অন্দেকর পাঁচটি দৃশ্যে ৪২-৪৩ সালের আমিনপুর তথা গ্রাম বাঙলার যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে, তা যেমন ব্যাপক ও বাস্তু বানুগ, তেমনি নাটকীয়। এই সমস্তু ঘটনা পরম্পরার তালিকাকে ক্ষুধা মারী মন্বন্তরে পীড়াগ্রস্তু আর্ত বাঙলাদেশের ইতিহাস বলা যায়। কিন্তু ইতিহাস তো কোথাও থেমে থাকে না। আর তাই শুধু ধবংসের বিপর্যয়ের চিত্র উপস্টথাপনাতেই সমাজ সচেতন শিল্পীর দায়িত্ব শেষ হয়না। কেননা ধবংস যতই বড় হোক, প্রাণের অন্দকুরোদগমের সেখানেই শুরু। শত হতাশা ও সহস্র বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষের বাঁচবার আশা সৃষ্টির আকান্দক্ষা, সে তো চিরন্তনঙ্গ মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও নিঃশেষে মরে না, 'নবান্ন' সেই বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে। দয়াল বলেছেঃ''মন্বন্তরের দাপটও তো গিয়েছে এই মাথার ওপর দিয়ে, ... আমরা তো বেঁচেই আছি। কই মরিনি তো আমরা সবাই মন্বন্তরে।'' কিন্তু কি সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র যা মানুষের বুকে বল, মনে শক্তি জোগায়ঃভয় থেকে অভয়ে পৌঁছে দেয়? 'নবান্ন' সেই সংবাদ বাঙলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেঃ''জোর জোর প্রতিরোধঙ্গ জোর প্রতিরোধঙ্গ'' এভাবেই তো মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ রচনা করে। এখানেই বলিষ্ঠ সংগ্রামশীল জীবনচেতনার পরিচয়। 'নবান্ন' নাটকের এই উপসংহারে পৌঁছুবার জন্য মানস প্রস্তুতি ঘটেছে চতুর্থ অন্দক প্রথম দৃশ্যে, গাতায় খাটার প্রতিশ্রুতিতে। সংঘশক্তি র এখানেই প্রতিষ্ঠা। তারপর ''জমির অর্ধেক ফসল গেরামের দুঃখী গেরস্টথ ভাইদের জন্য দিয়ে'' 'ধর্মগোলা' স্টথাপনের সন্দকল্পে তার প্রাণসঞ্চার। তৃতীয় দৃশ্যের প্রতিরোধ তো তারই পরিণত রূপ। দয়াল আমিনপুরে নানান বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে যে পাথেয় সংগ্রহ করেছে, সেখানে থেকে গড়ে উঠেছে এই বলিষ্ঠ জীবনদর্শন। 'নবান্ন'-এর শেষ দৃশ্যটা তাই নাটকের প্রথমাংশ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি পণ্ড হয়েছে, তা বলা যায়না। নিরঞ্জন বিনোদিনী, কুঞ্জ রাধা এবং প্রধানের শেষ অন্দেক পর্যায়ক্রমে ঘরে ফেলা একাট উপলক্ষ্য মাত্র।

পরিশেষে আর একটি কথা। নাটকের শেষ দৃশ্যটি নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও কোনো কোনো সমালোচকের মতে এ দৃশ্যটিই সব চাইতে ভালো। কেন না এই দৃশ্যে রন্দ্বগমঞ্চেঅবতীর্ণ হয়েছে পুরো একটি জনতা। তৎসত্ত্বেও দৃশ্যটির পরিচালনায় ও পরিকল্পনায় নাট্যকারের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় রয়েছে। গণনাট্য সংঘ, তার অনন্য সংঘশক্তি ও অভিনয় নৈপুণ্যে এই দৃশ্যটি সম্পর্কে জনমানসে একটি দীর্ঘস্টথায়ী প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাই সামগ্রিক বিচারে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, নবান্নে আপাতঃ কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও, একটি সফল নাট্যপ্রয়াস।

৪৮.১৭ সারাংশ

আধুনিক নাট্যাভিনয়ে আলো, ধবনি, আবহসংহীত প্রভৃতি গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। এগুলিকে নাট্যাভিনয়ে বা থিয়েটারের পরিভাষায়য় বলে নেপথ্য বিধান। থিয়েটারের দুটি অংশঃজ্ঞ১ৰ প্রত্যক্ষ অভিনয়, জ্ঞ২ৰ নেপথ্য অভিনয়। প্রথমটির পরিচয় পাওয়া যায়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংলাপ বা বাচিক ও অন্দগভন্দিগ সহযোগে মঞ্চেপ্রত্যক্ষ অভিনয়ে। এই অভিনয়কে মনোজ্ঞ, বাগ্ময় ব্যঞ্জনাধর্মী এবং অভিনয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য নেপত্য বিধানের অপরিহার্যতা সর্বজন স্বীকৃত। এতদুভয়ের সুসন্দগত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নাটক বাঞ্ছিত রস জারণ করতে পারে। নবানের কাহিনী শুধু গতানুগতিকতা বর্জিত হয়, এর